অরুণ দাশগুপ্ত

স্বাধীনতার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে: ১৯৪৬-৪৭এর ডায়েরি

সম্পাদনা ও অনুষঙ্গ: প্রবাল দাশগুপ্ত

প্রাককথন

আমার বাবা ঐতিহাসিক অরুণকুমার দাশগুপ্ত (৪.১.১৯২৫—১৫.৬.২০০৭) সেই প্রজন্মের ভারতীয় যাঁরা যৌবনে পা দিতেই স্বাধীনতা তথা দেশভাগ ঘটে যায়; ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত আত্মনির্মাণের সঙ্গে পরাধীন দেশের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন নানাভাবে মিশে যায়। হয়তো আমরা এখন এমন দূরত্বে পৌঁছেছি যেখান থেকে তাঁদের যৌবনে উত্থাপিত কিছু কিছু অমীমাংসার দিকে তাকানোর মানে হয়। কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাবার ১৯৪৬-৪৭এর ডায়েরি হাতে আসে। দেখতে পাই, তাঁর বৃত্তে আত্মনির্মাণের বিভিন্ন আদল নিয়ে যে সচেতন চর্চা চলছিল তার বাইরের খোলসটা সংবাদপত্রের বাঁধা গতের রাজনীতিতে আচ্ছন্ন থাকলেও তিনি নিজে ও তাঁর কাছের দুয়েকজন নানাবিধ রাজনৈতিক প্রকল্পের আবশ্যকতার পাশ দিয়ে এক ধরনের আত্মনৈতিক প্রচেষ্টার জায়গা শনাক্ত করে নিচ্ছিলেন।

ডায়েরির কয়েক পাতা পড়েই দেখতে পাওয়া যায়, অরুণ নিজেকে সমসাময়িক মেধাবী ছাত্র ওরফে ভালো ছেলেদের পাশে নিষ্প্রভ, গৌণ অবস্থানে বসাচ্ছেন বলেই তাঁকে এতটা দায়িত্বের ওজন মাথায় নিয়ে আত্মনির্মাণের কাজে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে, কাজটা কীভাবে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করবেন সে বিষয়ে অনেক অস্পষ্টতার ঘাট পেরোতে হচ্ছে। গৌণ অবস্থানে নিজেকে চিনে পথ বুঝে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ; তার চেয়ে মেধাবী ছাত্রের ভূমিকা পালন করা অনেক সোজা। ভালো ছেলেদের কাজ তো অন্যদের দেওয়া আদলের মাপে মাপে বসে যাওয়া; এ ব্যাপারে তাঁরা পোষকতা পেতে থাকেন শিক্ষকদের কাছে, দীক্ষাদাতাদের কাছে, অগ্রজ ভালো ছেলেদের ফজলিতর আম উৎপাদন করার আয়োজনের কাছে। কিন্তু যে-অরুণ শুধুই সহচর, উজ্জ্বল বন্ধুদের আলোর সামান্য ভাগ পেতে চাইছেন, তাঁকে সাহচর্যের কোনও মডেল ছকে দেবে না কেউ, ও কাজটা তাঁকে একাই করতে হবে; সহচরের তো আর কোনও সহচর হয় না। সেইজন্যেই ডায়েরি তাঁর এতটা অপরিহার্য সম্বল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে সম্বল আমাদের সময়ের কাছেও পাথেয় বলে প্রতিপন্ন হতে পারে কী যুক্তিতে।

আজকের দিনে কেউ কেউ 'সাংস্কৃতিক পুঁজি' বলে একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শিখেছে পিয়ের বুরদিয়্যো প্রমুখ মনীষীর কাছে। অর্থাৎ 'ভালো ছেলে' ব্যাপারটাতে ওই সাংস্কৃতিক পুঁজির বিশিষ্ট সামাজিক জ্যামিতির সঙ্গে পুরুষতন্ত্রে ছেলেদের লিঙ্গভূমিকার যে প্রতিচ্ছেদ তার বিষয়ে কোনও কোনও কর্মী মনোজ্ঞ ভাষ্যও রচনা করছে, তার অনুষঙ্গে রাজনৈতিক কার্যক্রমেও নতুন দিশা খুঁজে নিচ্ছে। একাজ তারা করছে পূর্বে অবহেলিত দলিত, আদিবাসী

প্রভৃতি এমন বৃত্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, যে বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকেই সাংস্কৃতিক পুঁজি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বহু যুগ ধরে।

দলিত বা আদিবাসীদের বিশেষ বঞ্চনায় জাত পাত শ্রেণি প্রভৃতি বর্গের যে আপতন, কিংবা মেয়েদের বঞ্চিত অবস্থানে লিঙ্গরাজনীতির যে বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আজ সমকামীদের বা রূপান্তরকামীদের যে জ্যামিতি বিচারের মঞ্চে চলে আসছে, সেইসব জায়গার দিকে মনোযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু সেই জরুরি তাগিদ মোতাবেক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই সেই সেই বিশিষ্ট বঞ্চনার ইতিহাসে কিংবা জ্যামিতিতে পথ হারিয়ে ফেলি। ধরে নিই সবাই তো জানে ওরা কেন বঞ্চিত, কারুরই তো বুঝতে বাকি নেই সেই বঞ্চনার প্রতিকার করবার জন্যে কী কর্মসূচির বাস্তবায়ন আবশ্যক। এ ধরনের সমস্যার পাশে চল্লিশের দশকে অরুণের লেখা ডায়েরির মতো সুপরিচিত বর্গের মধ্যবিত্ত-রচিত দলিলকে বসিয়ে প্রথম ঝোঁকে মনে হতে পারে, "ওই মধ্যবিত্ত মানুষটা নিজেকে ওই যে অপাঙক্তেয় ভাবছিল, কিংবা বন্ধুদের চেয়ে কম পাঙক্তেয় ভেবে তাদের পঙক্তির পাশে যে গৌণ অবস্থানে নিজের স্থানাঙ্ক বুঝে নিচ্ছিল, ওটার তো কোনও বর্গগত বিচার হয় না। কারুর বুদ্ধি বেশি হয়, কারুর কম, বোঝাই যাচ্ছে অরুণের কম ছিল, তাকে তো ভেবে বার করতেই হবে এই মুশকিলটা সে কীভাবে সামলাবে; ভালো কথা; এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে আমরা আজকের দিনে কেনই বা বসব?"

দ্বিতীয় বিবেচনায় হয়ত দেখতে পাব, আমাদের ওই প্রথম ঝোঁকটা একটু অর্ধচিন্তিত ছিল। অরুণ দলিত বা আদিবাসী বা নারী নন বলেই তিনি তাঁর গৌণতার যে ভাষ্য ছকতে বাধ্য হচ্ছেন, সেটা কোনও বর্গের পরিস্ফুট জ্যামিতির আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে না বলেই নিছক, অবিমিশ্র গৌণতার প্রশ্নমালা ছুঁড়ে দিচ্ছে সে অরুণের যৌবনের পরীক্ষাগারে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে মুখ্য বলে বরণ করা হয়; কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ গৌণ ভূমিকাতেই নামি। কেউ কেউ দলিত বা আদিবাসী বা নারী বা সমকামী ইত্যাদি ইত্যাদি বলে সেই বিশেষ বর্গের স্বতন্ত্র বঞ্চনার ইতিহাস যাপন করতে করতে নামি, কিন্তু অনেকেই ওসব কোনও তকমা আঁটা সমস্যার তাবিজ ধারণ না করেও গৌণ ভূমিকাতেই নামি, মধ্যমেধার বিড়ম্বনাবোধ তথা ব্যক্তিগত গ্লানিবোধ সামলাতে। ওই গৌণতার পরীক্ষা আমাদের দিতে হয় ক্রমাগত, নিঃশব্দে দিতে হয়। অরুণ যতটা সচেতনভাবে খেয়াল করতে থাকেন, সাংস্কৃতিক পুঁজিধারী ভালো ছেলেদের গৌণ সহচরের ভূমিকায় একরকম স্বীকৃত অর্ধসাফল্য পাবার জন্যে কী অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে, সেই সশব্দ ভাষ্য আমাদের সামনে অপ্রত্যাশিত ধরনের আয়না তুলে ধরে।

যদি দেখি আয়নাটাকে আমাদের সমকালের কাজে লাগাতে পারছি না, তাহলে বুঝতে পারব যে, নারীবাদী বইপত্র পড়ে, সাংস্কৃতিক পুঁজি নিয়ে নতুন কথাবার্তা বলতে শিখে, লিঙ্গচর্যার রকমফের নিয়ে নানাবিধ চর্চা করে, আমরা বিশেষের অনেক তল্লাটে পা ফেলছি ঠিকই, কিন্তু সামান্যর সঙ্গে সেইসব বিশেষকে জুড়বার উপায় এখনও ভেবে পাইনি। বুঝতে পেরে হয়তো আমাদের গভীর ঘাটতিটা মেটানোর দিকেও হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোতে শুরু করব।

কথাবার্তার এই রীতি দেখে কেউ কেউ হয়তো অযথা বিরক্ত হচ্ছেন। ঠিক আছে, আরেকটু ভদ্রভাবেই বলি। আজকের দিনে আমরা আত্মরচনা নিয়ে কেউ কেউ তাত্ত্বিক চিন্তনের নতুন

সূত্র প্রণয়ন করতে বসেছি, বিশেষত দলিতপ্রমুখ নানাবিধ ব্রাত্যদের আন্দোলনের পরিবেশে। সেইসব কাজে লাগতে পারে এই ডায়েরি, উপাত্ত হিসেবে। তাই এর কিছু পাতা তুলে ধরা। উল্লিখিত ব্যক্তিদের টীকায় সেটুকুই পরিচিতি দিয়েছি যা না পেলে পাঠক এগোতেই পারবেন না; প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছেন সৌরীন ভট্টাচার্য, শুভা চক্রবর্তী, চিন্ময় গুহ, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে আমার পরামর্শদাতারাও খবর দিতে পারেননি। সেরকম খবর জুগিয়ে দিতে যাঁরা পারবেন তাঁদের আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।

ডায়েরির বয়ান

কালিয়া

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে দেশে এসেছি। কলকাতার জীবন থেকে কত তফাত এখানকার জীবনযাত্রা। এ এক আলাদা জগৎ। বইএর[১] পাতায় পড়েছি চাষিদের দুঃখের কথা, শুনেছি বাংলার গ্রামের দুরবস্থার কথা, কিন্তু চোখ মেলে তেমন করে দেখিনি। দুবছর আগে এসেছিলাম এখানে। গ্রামের মানুষকে দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কলকাতার বাসিন্দা আমরা শহুরে জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবই নিয়ে আসি গ্রামে। কুইনিন ট্যাবলেটের বর্ম এঁটে সাত দিন কাটিয়ে আবার ফিরে যাই শহরে। শহরের মানুষেরাই চারপাশে থাকে ভিড় করে, তাই গ্রামে এসেও গ্রামকে দেখতে পাই না। ঠাকুর চাকর জিনিসপত্র নিয়ে যেমন করে লোকে বনভোজন করতে যায় আমরাও তেমনি এসেছি এখানে। সাত দিনের হাওয়াবদল, দৃশ্যবদল, মন্দ লাগে না। কখনও যদি ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট মানুষ চোখে পড়ে কলকাতার পরিচিত ভিক্ষুকশ্রেণির মাঝে তাদের মিশিয়ে দিই, ভাবনাচিন্তার কোনও দরকার পড়ে না। বৈঠকখানার ফরাসে খেলা হয় তাস, পাশা, ক্যারম ইত্যাদি। আলোচনা চলে কোন বাড়িতে উৎসবের কী আয়োজন হল তাই নিয়ে। গ্রামের লোকদের কলহপ্রিয়তা, তাদের মনের সংকীর্ণতা তীব্র সমালোচনার বিষয় এদের কাছে। "গ্রামের লোকদের কথা আর বোলো না। এমনি প্যাঁচালো লোক আর কোথাও পাবে না। সব সময় চিন্তা কী করে অপরকে ঠকিয়ে খাবে।"

শোনা গেল অমুক বাড়িতে জুয়ো খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্জাবি গায়ে পাম্পশু পরা বাবুদের ভিড় হল সেখানে। পূজোর সময় এই তো আমোদ, এই না হলে পুজো? আরে গ্রামে রেস্টুরেন্ট হয়েছে দুটো, চল্ চল্ সেখানে গিয়ে জমানো যাক। কোনও এক জায়গায় জমিয়ে বসে আমোদ করে সময় কাটানোই আমাদের মূল লক্ষ্য, বাড়িতে আসবার উদ্দেশ্যই তাই। পুকুরে সাঁতার, দুপুরে তাস, বিকেলে বিলে নৌকো চড়া, সন্ধ্যায় জুয়ো আর সারারাত থিয়েটার, এই হল মোটামুটি প্রোগ্রাম। দোষের কী? বছরে এই কটি দিনের জন্যে তো এসেছি বাড়িতে, একটু ফুর্তি করতে না পারলে আর কী হল।

এই গেল ছেলেদের কথা। পুজোর আরও একটি দিক আছে—কর্তাদের মহল। বাপ ঠাকুর্দারা কষ্ট করে বাড়ি ঘর দোর করে গেছেন আমরা তা রক্ষা করতে না পারলে তার মর্যাদা থাকবে কেমন করে? অমুক বছরে যা আয়োজন হয়েছিল তেমন আর কোনওবার হল না। সারা গ্রামে

আর কোনও বাড়িতেও অমন হয়নি। অমুক কর্তা ছিলেন খুব রাশভারি লোক, তাঁকে লোকে ভয় করত কত! আজকালকার নমঃশূদ্রেরা মাথায় চড়তে চায়। পালেরা তো দাম বাড়িয়েই চলেছে। ওদের যতই ভালো খাওয়াও কোনওদিন এতটুকু সুখ্যাতি করবে না। এ বাড়িতে খেয়ে গিয়ে ওই বাড়িতে নিন্দে করবে। পুজোর খরচ যত কমানো যায় ততই ভাল। পুজো মানে তো দশটা লোকের উপকার করা, তা ওদের ভালো করে খাওয়ানো হোক, কাপড় চোপড় দেওয়া হোক, সেই তো ভালো। আর যে বাড়িতে থাকা হয় না সেখানে টাকা ঢেলে কী হবে? যত খরচই করো এতটুকু বেশি নাম হবার উপায় নেই। সেন বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত ধূর্ত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তোষামোদ করে তেল ময়দা ইত্যাদি জোগাড় করেছে। গ্রামে ওদের যতটুকু প্রতিপত্তি সব ওই জন্যে। অত নিচু হওয়া চলে না। তবে হ্যাঁ ওদের গুণও আছে বলতে হবে। লৌকিকতায় এতটুকু ত্রুটি নেই, ঠাট বজায় রেখেছে তার উপর সারা বছর বাড়িতে থাকে। ...[২] আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে, আমরা কত খেটেছি, আর গুরুজনদের কত মান্য করতুম! আজকাল সব ফাঁকি দেবার টেণ্ডেন্সি হয়েছে। বাড়ি বাড়ি খাওয়া সবার সাথে আলাপ করা এসবের দিকেও নেই। আর মেয়েদের কথা, ও যত কম বলা যায় ততই ভাল।

বাড়ির দেয়ালের চুনবালি খসে পড়ছে, ছাতের উপর গাছ গজিয়েছে, তার শিকড়ে সারা দেয়াল গেছে ছেয়ে। মণ্ডপের পেছনদিকটায় একটা বিরাট ফাটল ক্রমশই গভীর হচ্ছে। বাড়ির পুকুর ছিল এ গ্রামের একটি সম্পদ। সেই পুকুর কচুরিপানায় ভরে প্রায় বুঁজে যাবার জোগাড় হয়েছে। ঘাটের কাছটায় হাত পাঁচ ছয় পানা সরিয়ে তাতেই কাজ চালানো হয়। চারদিকের পাড় ঘন জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। কয়েক ঘর প্রজা রয়েছে আমাদের পিছনদিককার জমিতে। সংখ্যায় ওরা জনা পঞ্চাশেক হবে। জেলে, চাঁড়াল, কুমোর সব রকমই আছে। এরা সারা বছর মাঠে খেতমজুরের কাজ করে, কেউ বা ঘর বাঁধে। পুজোর সময় বাবুদের বাড়িতে বেগার খাটবার নিয়ম। বিনে পয়সায় পুকুর পরিষ্কার করা, জঙ্গল কাটা, ঝাড় টাঙানো, ঘরদোর মোছা, সব কাজই করে দেবার কথা। আমরা যে ওদের আশ্রয় দিয়েছি। ওদের এই কাজ ওদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

ম্যালেরিয়ায় প্রায় অর্ধেক লোক উজাড় হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। রুগ্ন ছেলেমেয়ে কোলে করে এদের ঘরের বউরা উঠোনে এসে দাঁড়ায়—চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা করে দিন আপনারা। আপনাদের চোখের সামনে এরা মরবে কেমন করে দেখবেন? আমরা তো ওর চেয়েও বেশি দেখেছি কলকাতার উপরেই। রাস্তার দু ধারে না খেতে পেয়ে লোক মরেছে কাতারে কাতারে। তখনও হোস্টেলের ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনে বিঘ্ন ঘটেনি এতটুকু। রাস্তার আবর্জনা তো কতই থাকে। শুধু চালে কাঁকর পেলে খাবার ঘরের টেবিল চাপড়ে বিদেশি সরকারকে গাল দিয়েছে। ওসব দেখতে অভ্যস্ত আমরা, আমরা কি সহজে টলব?

যাত্রাদলের সাথে দরাদরি করে দেড়শো টাকায় রফা হল। প্রত্যেকবার গান হয়, এবার হবে না সে কি হতে পারে। সবাই এ বাড়ির নাম করে সেজন্যে। বংশের একটা গৌরবময় ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের কর্তব্য বইকি। হোক না আমাদের বাড়িটা ভাঙা, হলই বা আমাদের পুকুর অপরিষ্কার, ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু এই যে গরিব দুঃখীদের জন্যে আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করলাম এই কি কম?

সকাল বেলায় হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের এক সীমানায় গিয়ে পৌঁছোলাম। একটা প্রকাণ্ড বিলের এক ধার ঘেঁষে আমাদের গ্রাম। অন্যদিক দিয়ে বয়ে গেছে কালীগঙ্গা নদী। এই একটি বিলের উৎপন্ন খাদ্য থেকে অনেকগুলি গ্রামের ভরণপোষণ চলে। রাস্তার পাশের জলে কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো মাছ রয়েছে, চাষির ছেলেরা তাই শিকার করে বেড়াচ্ছে। চক্ষের নিমেষে কোঁচ দিয়ে গেঁথে ফেলল ছোটো মাছ একটা। কী উচ্ছ্বসিত আনন্দ। কোমরের কাছে ছোট্ট ধুতিখানা জড়ানো, হাতে বাঁশের কোঁচ, গলায় মালা, বিলের ধারে ধারে মাছ ধরাই ওর কাজ, ওর খেলাও বটে। পথে দুচারজনের সঙ্গে আলাপ হল। ইউনিয়ন বোর্ড বিশেষ কিছু কাজ করে না। কাজের মধ্যে গ্রামের রাস্তা, নালী আর আলো—এই তিনটির তদারক করাই প্রধান। তাও এরা করে না। টাকাওয়ালা লোকেরা প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে, গ্রামের মঙ্গলচিন্তা তারা নিশ্চয়ই করে, তবে লোকের কাছে সেটা প্রত্যক্ষ হয় না।

মাঠের উপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে আসছে। বাঁশ ঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি—পরিষ্কার জামাকাপড় পরা, চশমা পরা বাবু। রাস্তার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ে আমার উপর। অনেক কথা জমছে মনে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে জানি না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সামান্য সাহায্য নিলে এই খেতকে চতুর্গুণ শস্যশ্যামলা করে তোলা সম্ভব। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি আজ স্মৃতিকথা। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী, যুদ্ধ অতি সহজে লক্ষ লক্ষ লোককে ঠেলে দেয় মৃত্যুর পথে। এরা তাই মেনে নিয়েছে, আগের জন্মের কৃতকর্মের ফল নিঃশব্দে সহ্য করেছে এরা, পরিবর্তন যে কোনওদিন আসতে পারে সে বিশ্বাস এদের নেই। হিন্দু সংস্কৃতি আর মুসলিম সংস্কৃতির লড়াই চলছে শহরে শহরে আর বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম ম্যালেরিয়ায় সর্ব অঙ্গ জীর্ণ করে অতি দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে।

চোরাবাজারের থেকে এল পুজোর কাপড়, উৎসবের কেরোসিন তেল। শোনা যাচ্ছে নমঃশূদ্রেরা নাকি অনেক টাকা করেছে ধান পাট বেচে। ভদ্রলোকের টাকা কোথায় নমঃশূদ্রেরই তো টাকা। ওদের মধ্যে কত পুজো লেগেছে দেখুন গিয়ে। মুখের উপর হাত নেড়ে মুসলমান বাজনদার জানিয়ে গেল বাবুদের। তারাই বেশি টাকা দিয়ে সব বাজনদার নিয়ে গেছে, আপনার বাড়িতে সানাই বাজাব কী করে?

মানুষ অতীতকে ভোলে সহজে, ভবিষ্যতের তোয়াক্কা রাখে না, মানুষ জানে শুধু বর্তমানকে। দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে বাংলার নানা অঞ্চলে। তার খবরও তো এরা পায়, কই সে জন্যে এতটুকু বেশি বিচলিত হতে তো দেখি না এদের? দুর্ভিক্ষের রাজ্যে যাদের বাস তারা আর মৃত্যুকে ভয় করবে কেন? অমুকে মরে গেল, অমুকেও বোধহয় মরবে এসব কথা খুব সহজে বলে এরা। মনে হয় এদের অনুভূতির গ্রন্থি ভোঁতা হয়ে গেছে। যাত্রাগানে দুশো টাকা খরচ করতে দ্বিধা নেই, ওতে নাম হবে যে। ইস্কুল বিনা টাকায় নষ্ট হয়ে যাক, বিনা সংস্কারে পুকুর বুঁজে যাক, কার কী ক্ষতি তাতে।

শহরে গিয়ে আবার ভুলব এই বাংলাকে। আবার ফিরে যাব বিদেশি মাদকতার রাজ্যে। পৃথিবীর রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি অনেক জেনেছি কিন্তু দেশের মস্তিষ্কের যখন ভারসাম্য থাকে না তখনই সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ। আমার ভিটেবাড়ির লোকেরা যখন কিছুই

জানে না তখন অত জেনে কি হবে আমার। প্রাণে প্রাণে গাঁট বাঁধা রয়েছে এই কথাটা ভুলে যাই আমরা। জাতি না এগোলে আমি যে বেশিদূর যেতে পারব না একথা আমাদের মনে থাকে না। জ্ঞানের সঞ্চয় যতটুকুই হোক কোনওদিনই কি এটুকু মানুষের কাজে লাগবে না?

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

আমার পারিবারিক জীবনকে ঘৃণা করি আমি। সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা দিন কাটায়, যে যার সুখের চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের কুঠুরির মধ্যে দরজা এঁটে বসে থাকে। কারও চোখে মুখে এতটুকু জীবনের লক্ষণ নেই, দিনের পর দিন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে এরা।

পরিবারের বাইরের লোকেদের প্রতি এদের ব্যবহার অতি বিচিত্র। হোক না গ্রামের লোক, হোক না আত্মীয় তা থাকবার কি আর জায়গা নেই, এখানে এসে জুটবে কেন? বাইরের ঘরে অনাদরের আশ্রয় জোটে তাদের। অবশেষে একদিন আসে যখন তারই মঙ্গল চিন্তায় পরিবারের সকলে অস্থির হয়ে ওঠে। এই পরিবারের বাইরের আরও কোথাও যাওয়াই যে তার সত্যিকারের মঙ্গলের পথ সেই কথাটা তাকে বুঝিয়ে তবে এরা নিরস্ত হয়। মানুষকে কত সহজে অবজ্ঞা করে এরা, তাদের অপমান করতে গিয়ে নিচু হতেও এদের বাধে না।

পরিবারের তিনটি অংশের মধ্যে কোনও সত্যিকারের প্রাণের যোগ নেই। কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার চাপে এরা একত্র হয়ে আছে। আজ ভাঙন ধরেছে এদের যৌথজীবনে। একটা অসন্তোষ জমছে ভিতরে ভিতরে, কবে সব ভেঙে পড়বে কে জানে?

ক্রমশ অসহ্য লাগছে আমার। নিরন্তর প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে আমায় বাঁচতে হয়। অবশ্য একথা সত্যি আর্থিক জীবনে কোনও সংঘাত দেখা দেয়নি আজও। তাই উপরে উপরে একটা শান্তি রয়েছে পরিবারে। অশান্তি এখনও আমার জীবনে প্রচণ্ড ঝড়ের আকার ধারণ করেনি কিন্তু দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পারিবারিক জীবনকে ঘৃণা করি কিন্তু যে জীবনকে চাই তাকে পাবার জোর কোথায়? পরিবারের সর্বনাশা ব্যাধি আমাকে অব্যাহতি দেয়নি। আমি সবচেয়ে কষ্ট পাই এই রোগে। এদের জীবনে কোনও উদ্দেশ্য নেই সত্যি কথা, কিন্তু আমার জীবনের আদর্শই কি আমার মধ্যে পূর্ণ আসন পেয়েছে? সমর্থন না পেলে একলা দাঁড়াতে পারি না আমি। আমার চেয়ে যারা শক্তিশালী তাদের বলিষ্ঠ সহযোগিতা চাই।

২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

আমার চিন্তা-পদ্ধতি পরিণত মানের সাক্ষ্য দেয় না। কোনও idea বা চিন্তাকণা মনে এলেই কোথায় তার স্থান ঠিক করে উঠতে পারি না। কোন অবস্থা থেকে কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে অতি দ্রুত স্থির করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, বিশ্লেষণের পথে এগোতে গিয়ে বাধা পাই। আমার চিন্তা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না। দমকা হাওয়ার মতন বিচ্ছেদ রেখে এগোয়। কিন্তু এই ফাঁকগুলোকে ঠিক ফাঁক হিসেবেই রাখতে পারি না, আবর্জনার জঞ্জাল দিয়ে ভরে রাখি। আসল

কথা আমার উপলব্ধি নানা সংঘাতের ধাক্কা সয়ে, নানা বাধা ভেঙে এগোতে পারে না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে বলেই পদে পদে থমকে দাঁড়াই। আমার চিন্তায় প্রবাহের বেগ নেই, অভিযানের দুরন্ত সাহস নেই। সব সময়ে ফাঁকি ঢাকবার চেষ্টা করি, ধরা পড়বার ভয় আমায় ঘিরে থাকে। আমার বিভিন্ন দিকের অসম্পূর্ণতা একটা অস্বাস্থ্যকর সচেতনতা জাগিয়ে রেখেছে। মনের একটা সম্পূর্ণাবয়ব ধারণা আমার নেই। তাই কোথায় কখন কী গলদ ধরা পড়ে এই ভয়েই থাকি অস্থির। হিন্দু হোস্টেলের মিটিঙে গেলাম না, ডাফ হোস্টেলের নিমন্ত্রণে যেতে চাই না কেননা ভয় পাই আমার ইংরেজি বলবার দোষ ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু যাওয়াই উচিত ছিল। এভাবে আত্মগোপন করে থাকলে তো আমার চলবে না, একদিন তো মুখ ফুটে কথা বলতেই হবে।

চিন্তার এই মন্দগতির সঙ্গে আমার আলস্যপ্রিয়তার কোনও যোগাযোগ আছে কি? একটা কাজ আরম্ভ করে শেষ না করাই আমার স্বভাব। খানিক দূর এগিয়ে মনে হয় আজ এই পর্যন্ত রইল বাকিটা পরে হবে। এই "পরে হবে"র নীতি আমাকে দ্রুত দুর্বল করে দিচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে হচ্ছে কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই যদি পিছু হটতে হয় তাহলে চরম পরাজয়ের লজ্জা আমায় পঙ্গু করে দেবে।

বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির যে চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছি এই আমার পথ, এ পথ থেকে ভ্রষ্ট হলে কিছুতে চলবে না।

(এখানকার ইংরিজি বয়ান অপরিবর্তিত রেখেছি, কোথাও ভুল দেখিয়ে দেওয়া কোনও টীকা-টিপ্পনীও দিচ্ছি না।)

30 December, 1946.

I propose to write in English from now. Writing good English is a problem with me. Whatever I feel, whatever I think, I dare not express in English lest I make sad mistakes. Why is it that I cannot write bold English? One of the reasons is want of practice. I never make serious continuous efforts to express my thoughts in English. There is a time when young mind spontaneously catches new substances and absorbs them. It is a time when minds are capable of expansion and taking in new ideas and forms. That golden moment of my life has passed away, unnoticed. New and interesting ideas did not occur to me and whatever passed before my eyes I failed to observe. I did not grow in time. My desire to learn English is a somewhat belated desire created artificially by the pressure of circumstances.

There are of course other reasons. I had been a boy with a small reservoir of energy. I used up my energy in small operations. I do not know who is responsible for that but the fact remains. I was not given a good shaking at the proper time. I was not allowed to move freely about, to be influenced freely by the forces of life. There were always strings which pulled me from behind, I always knew that there is someone who will take care of me. This inherent instinct for reliance was encouraged. I never grew bold. I never learnt to stand on my own legs and see with my own eyes. Most experiences were made for me. I did not experience life directly. I was always shielded

from the strong currents of life. That is the reason why I never got used to it, that is why I exhaust myself too soon. Externally I was prevented from participating in the outdoor life. But I was not given a proper intellectual training. Concentration comes through practice. Nobody helped me to acquire this quality. Once again I missed the bus.

I feel that there are big gaps in my thoughts. My thinking is not a continuous flow of ideas. It gushes out from time to time. Even in thinking I tire myself very soon. My energy suddenly exhausts itself. Moreover I do not know the secret of generating new energy and releasing them. My whole personality is folded up within me. How to open it up? How to unfold the inner potentialities? I know that they are there. I am not an empty jug. I contain multitudes. Ideas shapeless, nebulous whirl beneath the surface. They never take shapes, they are never born. Sometimes the depths of my mind are stirred up. Energy, blind, purposeless force revolve within but does not get an outlet. I suffer from this terrible waste of life. The idea that I have set before me has a powerful pull which draws me at a terrific speed and hurls me down almost lifeless. But that is a rare experience. On other occasions I lie motionless, dry, used up, full of dead desires. The idea must draw me forward irresistibly but it must draw me continuously. It must arouse my personality permanently. I want to be what I desire. I want to unfold the greatest wonders of life itself. I know I am large but then I must see it. I must experience that expansion. I want to live again.

১২ জানুয়ারি, ১৯৪৭।

ডায়েরিতে ইংরেজিতে লিখব ইচ্ছা ছিল। প্রথম সুযোগেই তার অন্যথা হল। তাতে মারাত্মক দোষ নেই কিছু। ডায়েরি জিনিসটা স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি বহন করবে এই হল মূল কথা। ইংরেজি ভাষায় কোনও চিন্তাকে সহজে প্রকাশ করতে পারলে ইংরেজিতেই লিখব, নতুবা বাংলায়।

জীবনে একটা গতি এসেছে অনুভব করতে পারি। অনভ্যস্ত পায়ে দ্রুত চলবার অনুশীলন চলছে কিন্তু এখনই দ্রুত চলছি সে কথা বলতে পারি না। বাইশ বছর পার হয়ে এলাম। নতুন বছরের জন্মদিনে যার শুভেচ্ছা ও প্রীতি পেয়েছি আমার জীবনে সে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই নবীন আগন্তুককে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রস্তুতি আমার নেই। সেই অভাবপূরণের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। এতদিনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আমার দিগন্তের প্রান্তে দেখা দিয়েছে। এতদিন সত্য সুন্দরের স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলুম, আজ আমার জীবনে এদের প্রতিষ্ঠা করবার আহ্বান এসেছে। বাইরের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে রসদ সঞ্চয় করছি বিন্দু বিন্দু করে, শক্তি সঞ্চয় করছি ধীরে ধীরে। আমি আর থেমে নেই, নিঃসন্দেহে আমি এক নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। কোথা থেকে শক্তি পাব, কী কৌশলে বাধা এড়িয়ে যাব সে বিদ্যা আমার জানা হয়ে যাবে পথ চলার মাঝেই, কিন্তু প্রার্থনা করি একটি বস্তু—গভীর আত্মবিশ্বাস ও তীব্র সচেতনতা।

ওকে আমি গ্রহণ করেছি মনে মনে, কিন্তু এতদিন ওর প্রতি দায়িত্ব পালন করবার প্রশ্ন আসেনি। আজ আমরা মিলিত। এই মিলিত জীবনের পথে যত সমস্যা দেখা দেবে সবই উভয়ের সমস্যা।

খুব আশ্চর্য লাগে ভাবতে এই ঘটনার ইতিহাসটা। চুঁচুড়ায় আমার থাকার কথাও ছিল না, জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা। সেখানেই শুরু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চশমা পরা একটি মেয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল। পুরোপুরি হিন্দুর মেয়ে কিন্তু অতখানি ঔৎসুক্যভরা, অত সহজ মেয়ে আমার চোখে পড়েনি এর আগে। পথে আসতে আসতে, অনেকবার দেখাদেখি হল, ও বিশেষ কিছুই বোঝেনি, কিন্তু আমি নিজের গতি লক্ষ্য করছিলাম। হাওড়া থেকে বাসে এলাম, পথে অনেকক্ষণ দেখেছি, ও লক্ষ্যই করেনি। তারপর ওর অলক্ষ্যে বহুদিন এমনি করে ওকে দেখেছি, গ্রহণ করেছি, ওর সর্বাঙ্গ ভরে দিয়েছি আমার নিঃশব্দ ভালোবাসায়। ও কি জানেনি? নিশ্চয়ই জেনেছে কিন্তু সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। একদিন এক পত্রাঘাতের মধ্য দিয়ে ও জানল, আঘাত পেয়ে জানল। এর পর থেকে আমার আঘাত পাওয়ার পালা। সে পরীক্ষায় পার হয়ে এসেছি আমি। আমাকে ও বন্ধু বলে টেনে নিল পাশে কিন্তু সভয়ে। এক শিল্পীকে কেন্দ্র করে যখন ওর স্বপ্ন সুন্দর হয়ে উঠল, আমি ছিলাম ওর পাশে। কিন্তু কেন? আজ মনে হয় ওটা ঠিক নিঃস্বার্থ প্রীতি নয়, ওটা আশাবাদীর প্রতীক্ষা। পরে এমন একটা দিন এল যখন আমি নিজের কথা বলতে শুরু করেছি। ওকে বোঝাতে চেয়েছি যে ভালোবাসার এই অর্ঘ্য নিয়ে আর কেউ আসবে না। ও তখন দোটানায় পড়েছে। আমার অসম্পূর্ণতা ওর চোখের সামনে খুব স্পষ্ট ছিল, ও জানত আমাকে ও ওর পূর্ণ শ্রদ্ধা দিতে পারবে না, মানুষ হিসাবে আমাকে ও উন্নত পুরুষ বলে গ্রহণ করতে পারেনি। যাকে ও জীবনে পেতে চায় তার জন্যে অনেকখানি শ্রদ্ধা ওর সঞ্চিত রয়েছে—যার সুন্দর প্রকাশ আজও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে—যা প্রকাশের জন্য ওর ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে তীব্রতা শুধুই ব্যর্থতা এনেছে। চরম আত্মবিকাশের মধ্যে ও পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবেগের জোয়ার যেমন ওকে ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তেমনি বাইরের প্রতিরোধী শক্তি আরও উঁচু হয়ে ওকে ঘিরে ধরল লৌহবেষ্টনে। সেদিনের চূর্ণবিচূর্ণ মন তার বন্ধুর সাহচর্যের স্নিগ্ধ আশ্রয়ে স্থান পেয়েছিল। সেদিনও ও ভাবতে পারেনি এই বন্ধুটিই তার স্বপ্নমধুর জীবনের সঙ্গী। তারপর ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন এসেছে ওর জীবনে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ প্রকাশের পথ ছেড়ে ও বৃহত্তর জীবনের মাঝে সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে। সেদিনের ভেঙে যাওয়া মনে আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। আত্মার মুক্তি, আত্মপ্রকাশ যে কোনও ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নয় সে কথা হয়তো ও বুঝেছে। মানুষে মানুষে জাল বোনা যে সমাজ তার মুক্তিই ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্টির আবেগ এনে দেবে এই বিশ্বাসই আজ পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ধীরে ধীরে পরস্পরের আকর্ষণে কাছে আসছে। ওকেও এগিয়ে আসতে হয়েছে এই পথে। আমি ওর অতীতের বন্ধু, ওর জীবনের অনেক ভাঙাগড়ার আমি সাক্ষী, ওকে আমি চিনেছি, ওর কোনও কোনও অভাব হয়ত বা আমি মিটিয়েছি। তাই আজ নতুন পথে আমিই হলাম ওর সঙ্গী, পথপ্রদর্শক নয়, গুরু নয়, শুধু বন্ধু। জীবন পথে চলতে চলতে, একই সমস্যার সমাধান করতে করতে যে আত্মীয়তা জন্মায় সে আত্মীয়তা আমাদের মধ্যে এসেছে। ওর বন্ধুর অভাব আমি মিটিয়েছি, আমার গণ্ডি এখানেই সীমাবদ্ধ। নতুন নতুন অভাববোধ ওর দেখা দেবে, সেদিন আমার সাহচর্যই যথেষ্ট হবে না। কিন্তু সেদিন নতুন বন্ধু সংগ্রহ করতেই বা বাধা কিসের?

সাংসারিক কারণে ঘর আমাদের একটিই রইবে, সেই ঘর বেঁধে রাখব আমি, কিন্তু আমার বন্ধুকে আমি তার চার দেওয়ালের মধ্যে কিছুতেই আটকে রাখব না। আমি ওর আজীবন বন্ধু, ওর দুঃখের দিনের একান্ত নির্ভরযোগ্য সাক্ষী, কিন্তু তাই বলে ওর আনন্দের অভিযানে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে রইব না। ওর সৃষ্টিশীল মন নতুন সামগ্রী সংগ্রহ করে নেবে, নতুন সাহচর্য খুঁজে নেবে নিজের প্রয়োজনে, কিন্তু ঘরের নীতির সঙ্গে তার বিরোধ নেই। আমার বিভিন্ন দিকে যেমন বিভিন্ন সঙ্গী থাকবে তেমনি ওরও থাকবে, কিন্তু মূলত আমরা একই চেতনায় নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সেখানে আমাদের বিচ্ছেদ নেই।

১৬ জানুয়ারি।

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা ওদের বারান্দায় বসে ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছিলাম, "এই দিনগুলি ভুলে যেও না, অনেক কিছুই হয়তো ভুলে যাবে কিন্তু আমাদের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তুমি ভুলো না।" ভালবাসার অনুভূতি এক একদিন অমনি সহজ স্নিগ্ধ হয়ে মনকে ভরে দিয়েছে, আমাদের চারপাশ ঘিরে যে বাতাস ছিল সেদিন এর যে সৌরভ তাতে ভেসে গেছে। মনে হয় সেই সব দিন ও ভুলে গেছে, নইলে কেমন করে ওকথা বলল আজ?

ক'দিন আগেও কথা হয়েছে যে পরস্পরকে আমরা টেনে রাখব পরস্পরের কাছে, ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না কিছুতেই। আর আজ অত সহজে ও ছেড়ে যাবার কথা বলতে পারল। কি লিখেছি আমি, কি এমন সর্বনেশে প্রশ্ন তুলেছি যার জন্যে এমনি করে ওর মনকে কঠিন করে দিল? "আসল সম্পর্ক সম্বন্ধেই যে প্রশ্ন তুলেছ"—কত কঠিন স্বরে বলল ও। প্রায় আড়াই বছর আগে ওর সঙ্গে দেখা। তারপর থেকে ক'টা দিন ওর পাশে ছিলাম না সে কি ও বলতে পারবে? প্রথম দিকের সেইসব দিনগুলোর কথা ও কোনওদিন জানবে না। সেদিনের তীব্র উন্মাদনা ওর উপেক্ষার দেয়ালে ঘা দিয়ে দিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ক'টা দিন ওকে আঘাত দিয়েছি আমি, ও যা চেয়েছে কদিন আমি তা উপেক্ষা করেছি। দিনের পর দিন গিয়েছি ওর কাছে, কত বাধা সত্ত্বেও ওর সাথে সহযোগিতা করেছি সে কিসের জন্য? কলকাতায় আসবার পর থেকে যত সুন্দর চিন্তা, কামনা ওর মনে এসেছে কে তাকে সমর্থন করেছে, অভিনন্দন জানিয়েছে বলুক ও। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কবে ওকে আমি অপমান করেছি, কবে ওর অমর্যাদা করেছি আমি? তবে কেন ও এমন করে বলতে পারল? আমার প্রশ্নের ধাক্কায় এতখানি সন্দেহ কোথা থেকে এল? হয়তো বা আমার কথায় প্রাণহীনতা লক্ষ্য করেছে ও, হয়তো বা অভিনয়ের আভাসও পেয়েছে। ভালোবাসার আকর্ষণ যদি স্বাভাবিক নিয়মে ওকে না টানে তাহলে অভিনয় দিয়ে তো তাকে সত্য করা যাবে না। আর কিসের জন্যে এই অভিনয়? ছলনার মধ্য দিয়ে ওর কাছ থেকে কী পাব আমি? ওর মনুষ্যত্বকে, ওর ব্যক্তিত্বকে যদি আমি কোনও বিশেষ মূল্য না দিয়ে থাকি তবে ওর সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে কী এমন জিনিস পাব আমি?

দুবছর পরে মনে হয়েছিল সত্যি করে ওকে পেলাম বোধহয়, আমাকে হয়তো ও চিনেছে। জানি না চিনেছে কিনা, জানি না সত্যি করে আস্থা রাখতে পারে কিনা, হয়তো বা আবার আমায় নতুন করে পাবার সাধনা করতে হবে। কিন্তু কেন? আমি কি উপযুক্ত প্রমাণ আজও দিতে পারিনি? তবে আর কেমন করে দেব? কী করতে হবে আমাকে? কী সেই পরীক্ষা?

পার্কের বেঞ্চির উপর বসে বসে ভাবছিলাম আমার নিজের কাছেও কি নিজের সত্য পরিচয়টুকু পাব না? আমি কি ভালোবাসি না? সত্যিই কি তাই? তাই যদি সত্যি হয় তবে ওর কাছে যাই কেন? ওর দেহের আকর্ষণে? কিন্তু ওর চেয়েও সুন্দরী মেয়ে আমায় আরও আকর্ষণ করে না কেন? ওর দেহের আকর্ষণই যদি একমাত্র আকর্ষণ হয় তাহলে ওর দুঃখের দিনে আমি কষ্ট পাই কেন? কষ্ট কি তাহলে পাই না? সেও কি আমার আত্মপ্রবঞ্চনা? আমি আর ভাবতে পারি না, ওর কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব চাইব। ও কী মনে করে? আমি যা বলেছি, যে ব্যবহার করেছি তাকে কী চোখে দেখে ও, কীভাবে গ্রহণ করে ও? সবই কি মিথ্যে, সব কি চাটুকারিতা?

আমাদের সম্পর্ক যদি মিথ্যে হয় তাহলে আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু সম্পর্ক যদি সত্য হয় যদি দুজনকে দুজনের প্রয়োজন থাকে তাহলে cousin marriage ভালো মনে করি কিনা[৩] তার উপর কিছুই নির্ভর করতে দেব না। আমার যদি কোনও ভুল মত থাকে সেটা না হয় শুধরে নেওয়া যাবে কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা আমরা পরস্পরকে কি সত্যিই গ্রহণ করেছি না প্রবঞ্চনা করেছি?

ওর নিজের যুক্তির মধ্যেও গলদ রয়েছে। যা ও উচিত নয় বলে মনে করে সেই জিনিস ঘটলে ও ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করবে না। কেন করবে না? যেটা অনুচিত সেটা ঘটলে যদি কোনও ক্ষতি না হয় তবে সেটা অনুচিত কী অর্থে?

তবে আমার কথার মধ্যেও গলদ ছিল, স্বীকার করব। যে বিবাহ সুস্থ সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত তাকেই বিবাহ বলে মেনে নেব, সে তাদের মধ্যে আগে যে সম্পর্কই থাকুক। ডাক্তারের মত অনুসারে কতটা পার্থক্য রাখা দরকার সেটা অবশ্য বিচার করে দেখতে হবে। ডাক্তারি যুক্তি ছাড়া আরও একটি যুক্তি খাটে এক্ষেত্রে। নর নারীর সম্পর্ক এক একটি বিশিষ্ট খাতে বয়ে চলে। ছোটো বেলা থেকে যারা ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে গড়ে ওঠে তারা মনকে একটি বিশেষ পথে চালিত করে। সেই পথে স্নিগ্ধতা থাকতে পারে, মধুরতা নেই। ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্কের যথাযথ পরিণতির জন্যে অনেকখানি অপরিচয়ের প্রয়োজন আছে। পরস্পরকে আবিষ্কার করতে করতে দুজনে কাছে আসে ও দুজনের কাছে দুজনের একটি পরিচয় থাকে। দুর্লভ জিনিসকে জয় করে নেবার কাজে ভালবাসার সাধনা নিয়োজিত হয়। অস্পষ্ট, আবদ্ধ মনকে সুন্দর করে, উন্মুক্ত করে, মুক্ত করে দেবার কাজে ভালবাসার প্রয়োজন, এই প্রয়োজনের তাগিদেই ভালবাসার জন্ম, এই তাগিদ যেখানে নেই সেখানে ভালবাসাও নেই। ভাইবোনের সম্পর্কের থেকে বন্ধুসম্পর্ক বা প্রিয় সম্পর্ক তাই স্বতন্ত্র। যারা ভাইবোন বলে পরস্পরকে জেনেছে তারা যদি বিবাহ করে তাহলে বলব ভুল করেছে কিন্তু যারা ভাইবোন বলে পরস্পরকে জানেনি তারা যদি রক্তের সম্পর্কে ভাইবোনও হয় তাহলেও সে বিবাহকে অনুমোদন করা চলে।

কিন্তু এ সব আলোচনার আগেই ও বলে বসল যে আমি নাকি আমাদের মূল সম্পর্ককে প্রশ্ন করেছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে ও সত্যি করে তাই মনে করে। যেকোনও ভাবেই হোক আমার কথায় ও আহত হয়েছে। এ কথা সেই মনেরই প্রকাশ। ওর ক্ষত আমি সারিয়ে দেব কিন্তু এ সম্পর্ককে এত সহজে আমি অস্বীকার করতে দেব না। আমার ভালোবাসায় যদি

ওর সন্দেহ থাকে সে কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে ওকে। এ প্রশ্নকে কিছুতেই চাপা দেওয়া চলবে না।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭
কলকাতা

অনেকদিন পরে পড়াশুনোর কাজে মন দিয়েছি। ছাত্রজীবনের ফাঁকিটা আজ আমাকে আঘাত করছে। পাকা করে কোনও জিনিসই শেখা হয়নি। অল্প শেখার অভ্যাসের ফলে এমনি একটি মন তৈরি হয়েছে যা পাকা করে কিছুই শিখতে চায় না।

কোনও বিষয়ে মন দিলে বেশিক্ষণ মন সেখানে থাকতে চায় না। [....] অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি আধখানা কাজ করে ছেড়ে দেওয়া এটা আমার জীবনীশক্তির অভাবের অথবা মনঃসংযোগের ক্ষমতার অভাবের একটা লক্ষণ। সৃষ্টির চাঞ্চল্য আমি অনুভব করি না। কোনও চিন্তাকে বা ভাবকে সুন্দর করে প্রকাশ করব এই ইচ্ছা থাকলেও তাকে প্রকৃত ইচ্ছা বলব না কেননা তার পিছনে উদ্যম নেই।

[...] এত ধীরগতিতে আমি এগোই যে শেষ পর্যন্ত সব কাজই না করা অবস্থায় থেকে যায়। এর কারণ কী? সম্ভবত আমার বুদ্ধির দুর্বলতা ও মন্দগতি এর মূলে রয়েছে। দ্বিতীয়ত জীবনের লক্ষ্যস্থলে অতি দ্রুত পৌঁছোনো দরকার এমন কোনও তাড়া অনুভব করি না। ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে এগোলেই হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও কাজকে শেষ করতে না পারলে যে তার পরে আর কোনও মূল্যই থাকে না এ কথাটা আজও তেমন করে বুঝিনি।

সহপাঠীদের কাছে নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। এই হীনতাবোধ আত্মপ্রকাশের পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করছে। বেপরোয়া হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি না, সাবধানী বুদ্ধি আমাকে পেয়ে বসেছে। অশোক,[৪] তপন,[৫] অম্লান,[৬] হরিদাস,[৭] রঞ্জিত[৮] এরা কত বেশি উন্নত, কত বেশি developed। খুব একটা সঙ্কোচ বোধ করি এদের কাছে। একটা ইস্কুলের ভালো ছেলের আত্মবিশ্বাসও আমার নেই। সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি এই বুঝি বিদ্যের গলদ ধরা পড়ল, এই বুঝি বোকা বনে গেলাম, সবার চোখে এই অস্বাস্থ্যকর আত্মসচেতনতা আমাকে ছোটো করে, নীচু করে বেঁধে রেখেছে।

ভালো করতে হবে পরীক্ষায়, পরীক্ষায় যাই হোক, নিজের কাজ চালাবার মতন বিদ্যেটুকু সংগ্রহ করতে হবে ও তার ব্যবহার জানতে হবে—এই হল আমার বর্তমান লক্ষ্য। কেন? আমি দাবি করি আমি আধুনিক যুগের ছেলে এবং এও বলি যে আধুনিক যুগ মধ্যযুগ থেকে উন্নত। আমি যে আমার পুরোনো যুগের মানুষদের চেয়ে উন্নত এই কথা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। এই প্রমাণ যতদিন না করতে পারব ততদিন নিজের ব্যক্তিত্বকে সত্যকার মর্যাদা দিতে পারব না। আমি যেভাবে থাকতে চাই সমাজের আর দশজনের কাছে তাকে সমর্থন করতে পারব না, তাই আমাকে আরও জানতে হবে, আরও শক্তি অর্জন করতে হবে।

বাড়ির সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ শেষ হয়ে আসছে। শুধু মৃত দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চেপে রইবে। অথচ এদের দয়ার উপর আজও নির্ভর করে রয়েছি। এই কথা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠি। কবে আমি নিজের কথা নিজের জোরে বলতে পারব? কবে আমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব?

কলকাতা

৩ ফেব্রুয়ারি।

এক এক সময় মনে হয় আমি কিছুই শিখিনি। এম.এ পড়ছি, এক বছর বেশিই পড়ছি,[৯] এদিকে আগের পড়া সব কিছু ভুলে বসে আছি। ইস্কুলের বিদ্যেটুকু পর্যন্ত আজ ভুলে গেছি। এত বড়ো ভুল যার জীবনে সম্ভব তার জীবনে উন্নতি কি করে হবে? ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত, ভূগোল অনেক কিছু শিখেছিলাম ছেলেবেলায়। প্রায় সবই ভুলেছি। খানিকটা চর্চা করতে হয় বলে ইংরেজির জ্ঞানটুকুই সম্বল আর সামান্য কিছু ইতিহাস। অম্লান, হরিদাস এরা কত বেশি শিখেছে, কত বেশি জানে! অম্লানের প্রভাবে আমার চিন্তা করবার শক্তি জন্মেছে, কিন্তু সংযমের এত অভাব আমার চরিত্রে যে সেই শক্তি সুসংবদ্ধ ভাবে কোনও কাজে লাগল না। খাপছাড়া ভাবে এতদিন জীবনটা কাটিয়েছি, কোনও স্থির লক্ষ্য নেই, নিয়মিত অনুশীলনের বালাই নেই, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে যাওয়ার উদ্যম নেই—উদ্দেশ্যহীন নিরুৎসাহ ছন্নছাড়া জীবন। বাইরের অবস্থা আমার চারদিকে যে গণ্ডি টেনে দিয়েছে এমন কোনও অনুভূতি আসেনি যার তাড়নায় এই বাধা জোর করে প্রকাশ্যে ভেঙে নিজেকে প্রকাশ করেছি। দাসত্বের আর বশ্যতা স্বীকারের মনোভাব আমার মজ্জায় মজ্জায় রয়ে গেছে। এতদিন পরে আজ বাঁচবার প্রয়োজন অনুভব করছি কিন্তু আমার উপকরণের যে এত দৈন্য এ আমার জানা ছিল না। শিক্ষার মাঝখানে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক রয়ে গেছে। দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে।

আমার শিক্ষা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস, অন্তরের আগ্রহে খুঁজে নেওয়া নয়। বড়দার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখি ভয়ে ভয়ে। তারপর থেকে একজন না একজন মাষ্টার মশাইকে বরাবরই পেয়েছি। এই নির্ভর করবার অভ্যাস আমার সর্বনাশ করেছে। নিজের চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস জন্মাবার সুযোগ পাইনি। ধারাবাহিক ভাবে আমার শিক্ষা চলেনি। এক এক ধাক্কায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি আবার অনেক স্তর ডিঙিয়ে এক উঁচু ধাপে গিয়ে উঠেছি। অশোক, তপন ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সব সময়ে মনে হয় আমি তো কিছুই জানি না, কত ছোটো আমি, ওরা কেমন লিখতে পারে, আমি তো পারি না। আমি অনেক শিক্ষা ডিঙিয়ে গিয়ে ভালো ছেলেদের ভাবভঙ্গি কেমন করে জানি আয়ত্ত করে ফেলেছি। আমার কথা শুনে যদি কেউ ভাবে যে আমি একজন ভালো ছাত্র তাহলে খুব আশ্চর্য হই না, কিন্তু এই ব্যাপারটায় আঘাত পাই। এই ফাঁকি যে নিজেকেই দিচ্ছি। প্রফেসারদের অনেকেই আমার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা রাখেন অথচ আমি পরিশ্রম করবার শক্তি, লেখবার অভ্যাস হারিয়ে বসে আছি। অসহ্য লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পালাবার কোনও পথ নেই, এই কথাটা বোধহয় এতদিনে জেনেছি।

আমার ভাষা একটা ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। নতুন স্তরে উঠবার এ কি পূর্বলক্ষণ? জানি না। কিন্তু আমার কলম চলতে চায় না, মানসিক ক্লান্তিতে সব আচ্ছন্ন থাকে এইটেই সবচেয়ে বিপদের কথা।

কোন পথে জীবনের ধারার সাথে মিশতে পারব, কে আমাকে বলে দেবে? যেভাবে দিন কাটাই, —কর্মহীন, লঘু চিন্তায় ভরা দিন—আমার অসহ্য লাগে। মনে হয় এ মিথ্যা আচরণ

করছি নিজের সঙ্গে। এ আমার সত্য পরিচয় নয়, কখনোই নয়। আমার মধ্যে শক্তি আছে, পুঞ্জীভূত শক্তি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলবার রহস্য আমার জানা নেই। কেমন করে জানব সেই মন্ত্র?

বাড়িতে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় দিন কাটাই। নিজেকে সব সময়ে অপরাধী মনে করি। যেমন করেই হোক আমার ব্যক্তিত্বের উপর এদের শ্রদ্ধা নেই। আমি যে খাঁটি লোক এই ধারণা ওদের হয়নি। অভিনয় করে সে ধারণা এনে দেওয়া যাবে না, সত্য ব্যবহার দিয়েই সে বস্তুকে প্রমাণ করতে হবে। আমি নিয়মিত পরিশ্রম করি না। অনুশীলনের ফলে চরিত্রের যে দৃঢ়তা আসে আমার চরিত্রে সে জিনিস আজও আসেনি। কেমন করে এরা আমাকে শ্রদ্ধা করবে? এদের পথকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে চাই অথচ অন্নবস্ত্রের জন্য এদেরই উপর নির্ভর করে আছি। এই অপরাধবোধ আমাকে ছোটো করে দিচ্ছে, আমার ব্যক্তিত্বের উন্মেষের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

চারদিক থেকে সঙ্কট ঘিরে আসছে। এখনও কি আমার সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে না?

৫ ফেব্রুয়ারি।

রঞ্জিতদা এসে পড়ছেন আমার জীবনে। গরজটা আপাত দৃষ্টিতে রঞ্জিতদারই বেশি কিন্তু আমিও যেন একটু আনন্দ বোধ করি ভিতরে ভিতরে। বেশ লাগে রঞ্জিতদার সাহচর্য, বেশ জীবন দিয়ে ভরা।

রঞ্জিতদাকে প্রথম দেখি কলেজে। বেশ মোটামুটি ফিটফাট চেহারা, চশমা পরা বেশ উজ্জ্বল চেহারা। শুনলাম, রঞ্জিত গুহকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হবে, ক্লাসে ক্লাসে তারই প্রতিবাদ সংগ্রহ করছে ছেলেরা। হিন্দু হোস্টেলেও মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যেত রঞ্জিতদার। ভাল ছেলে, ইন্টারমিডিয়েটে ভাল করেছে, ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল, হাসিখুশি ছেলে, কথাবার্তার মধ্যে যেন বেশ ধার আছে। এক কথায় রঞ্জিত আদর্শস্থানীয় না হলেও আকর্ষণের বস্তু, অনুসরণ করা না গেলেও অনুকরণ করা চলে।

অনেকদিন রঞ্জিতদার দেখা মিলল না। শোনা গেল, বাবা ওঁকে মেরেছেন, বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন, রঞ্জিতদার অপরাধ তার রাজনীতিনিষ্ঠা। অনেক দিন ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে পরে আবার ঘরে আশ্রয় জুটল এবার শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল সকলে। বাবা নির্বিকার রইলেন।

হঠাৎ একদিন দেখা হল রাস্তায়। অম্লানের সঙ্গে পরিচয় ছিল, ওর সঙ্গেই কথা হল। ময়লা জামা কাপড়। কাবলি জুতো—বকলসের তলা দিয়ে পরা, রুক্ষ চেহারা, হাতে অনেক কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি। বললেন, "খুব আশা নিয়ে পড়াশুনো কোরো না, আমিও তো ওই ভাবে জীবন আরম্ভ করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। কোথায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় কিছুই বলা যায় না"। অম্লানের কাছে মাঝে মাঝে শুনেছি রঞ্জিতদার কথা—ভাল ছেলে, আদর্শবাদী, স্বেচ্ছায় কষ্টের পথ বেছে নিয়েছে। শ্রদ্ধা হত।

আগস্ট আন্দোলনে আরেক মূর্তিতে দেখলাম রঞ্জিতদাকে। কমিউনিষ্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম সমর্থন করেনি, কিন্তু জনতা বিক্ষুব্ধ। রঞ্জিতদা সাহসের সঙ্গে

সেই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে জোরের সঙ্গে নিজের মত প্রচারের চেষ্টা করলেন। বাধা পেলেন বিস্তর। তবু বললেন। উন্মত্ত উত্তেজনা দেখলাম রঞ্জিতদার মধ্যে। ওই রোগা শরীরে অতখানি উত্তেজনা আমি আশা করিনি। কমিউনিস্ট নীতি, কংগ্রেস নীতি কিছুই স্পষ্ট করে জানতুম না সেদিন কিন্তু অতখানি বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা দেখে রঞ্জিতদার উপর শ্রদ্ধা অনেক বেশি বেড়ে গেল।

ইউনিভার্সিটিতে এসে আমার দেখা হল রঞ্জিতদার সঙ্গে। ছাত্রনেতা রঞ্জিত গুহ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সংগঠনের আশ্চর্য ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছু শুনতাম। প্রত্যক্ষ পরিচয় তখনও ঘটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি হলে একদিন সকালে রঞ্জিতদার সঙ্গে সামান্য পরিচয় হল। তারপর থেকে প্রায়ই কথাবার্তা হত—ছোটোখাটো আলাপ।

ঘনিষ্ঠতা বাড়ল পরীক্ষার ঠিক কিছু আগে ও পরীক্ষার পরে। অনেকখানি বিস্মিত হবার ক্ষমতা আছে রঞ্জিতদার। কিশোর সুলভ উৎসাহ ও গাম্ভীর্য আছে প্রচুর পরিমাণে। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও সহজ প্রাণখোলা আড্ডা এই কটি রঞ্জিতদার প্রিয় বস্তু। আমার সঙ্গেও এখানেই মিল যদিও আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। যেখানে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠছে সে হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। আমরা দুজনেই এক পথের যাত্রী। এই বিপদসঙ্কুল পথে পরস্পরকে আমরা রসদ জুগিয়ে চলতে পারব। তাই আমাদের বন্ধুত্ব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শুরু হলেও আজকে এর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

কলকাতা
১৬ই ফেব্রুয়ারি[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাবার জন্ম। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে এক সংস্কৃতি আন্দোলন জন্মগ্রহণ করেছিল। কলকাতাই সেই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই আন্দোলন থেকে বহু দূরে ছিলেন, তাই বাবা বিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেও এই আন্দোলন থেকে শক্তি আহরণ করতে পারেননি। স্যার সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক কাজকর্মের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা উনি, গান্ধিজির সাথে ছবি তুলেছেন কিন্তু এঁদের কারও চিন্তাই বাবার জীবনে গভীর ছাপ রেখে যায়নি। যে পরিবারে মানুষ হয়েছেন ছোটোবেলায়, শিক্ষার বয়সে তার কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁর অপ্রীতি ছিল না। বংশপরম্পরায় যে ব্যবস্থা চলে এসেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বা তাকে বিচার করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। পূর্বপুরুষরা যেমন করেছেন তেমনি মোটামুটি ভদ্র উপায়ে অর্থ উপার্জন করে পরিবারকে সেবা করা ও তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করাই তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিল। পরিবারের বাইরের আত্মীয় স্বজন নিয়ে যে পৃথিবী তার বাইরে দৃষ্টি কোনওদিন প্রসারিত হয়নি। এই সংকীর্ণ গণ্ডির বন্ধনের মধ্যেই বাবার শৈশব, কৈশোর অতীত হয়ে গেল। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে যে জাতীয় আন্দোলন দেখা দিল তার গুঞ্জন দূর থেকে এ পরিবারের কানে এসে পৌঁছেছে কিন্তু এ পরিবারের কেউ সে আন্দোলনের ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি। সরকারি চাকরি ছিল সম্মানের কাজ, সকলেই গর্ব অনুভব করত ওই কাজ পেলে। বাবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিদেশি সরকার অতএব তার অধীনে কাজ করব না এ চিন্তার অবকাশও ছিল না। কতদিন আমার শৈশবে গল্প শুনেছি কেমন করে স্বয়ং পঞ্চম জর্জ ঠাকুর্দার

বুকে মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চম জর্জের ছবি আজও দেশের বৈঠকখানায় টাঙানো রয়েছে। শুনেছি বাবার আদর ছিল বেশি, কর্মস্থল থেকে এলে ভালো মাছটা, দুধটা ইত্যাদি বাবাকেই দেওয়া হত। সম্ভবত সরকারি চাকুরে বলেই এই বিশেষ সম্মান বাবার জুটত।

বিদেশি সরকারের অন্নে যে শ্রেণি পুষ্টিলাভ করেছে আমাদের পরিবার সেই শ্রেণির অঙ্গীভূত হল। দাসত্বের মনোভাব সর্বঅঙ্গে বিস্তার লাভ করল। কিছু বিদ্যা শিক্ষার পরেই ভালো একটি চাকরি এই ছিল লক্ষ্য। ব্যবসার দিকে কিছু কিছু চেষ্টা যে হয়নি তা নয় কিন্তু সে দিকে উদ্যম দেবার ইচ্ছাও বোধহয় ছিল না। জ্যাঠামণি আর ছোটোকাকা টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেবেছিলেন, তাঁরা সফল হলে আজ আমাদের পরিবার আরও উঁচু স্তরে উঠে যেত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অথবা দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা সফল হননি।

বাবার বিবাহিত জীবনে ও চাকুরি জীবনে নতুন প্রভাব পড়তে লাগল। আলিপুরের সমাজ[১১] তার আধুনিক কায়দা-কানুন, খোলা আবহাওয়া বাবাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। সাহেবি কায়দা ভালো, সাহেবি অভ্যাস ভালো, সাহেবি শিক্ষা ভালো এই ধারণা বেশ বদ্ধমূল হল। চাকুরি জীবনে সাহেবদের সংস্পর্শে এসে তাদের গুণই চোখে পড়েছে বেশি। পরাধীনতার জ্বালা কোনওদিন অনুভব করেননি কেননা সত্যিই জীবনে অতি সামান্যই সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাহেবের অধীনতা খুব সহজেই মেনে নিয়েছেন। ওরা কত উন্নত, ওদের কাছে কত শেখবার আছে আমাদের। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার কী মূল্য তা জানা ছিল না। জানবার সুযোগ হয়নি। তৃতীয়ত, যে শ্রেণি ইংরাজের শোষণে জর্জরিত আমরা সেই শ্রেণির লোক নই। ইংরাজের প্রসাদে যারা পুষ্ট আমরা সেই শ্রেণি। কাজেই জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইংরাজ বিরোধী হবার কোনও প্রয়োজন আমরা দেখিনি।

এদিকে পরিবারের বাইরে স্বদেশি আন্দোলন ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে চলেছে। ভারতবর্ষের অতীত যুগ ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। ইংরাজ রাজত্বের লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে না পারলে মানুষের মতন বাঁচতে পারা যাবে না এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল। দেশের কবি, চিন্তাশীল ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির বক্তৃতায় রচনায় এক নতুন যুগের আহ্বান জেগে উঠল। পুরোনো দিনের আবহাওয়া কেটে গিয়ে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। এই যুগে জন্মেছি আমি। তাই ছোটোবেলা থেকে দেশের স্বাধীনতা প্রয়োজন সেকথা বুঝতাম। ইংরাজ খারাপ, স্বদেশি ভলান্টিয়ারেরা ভালো, এই ধারণা ছিল স্পষ্ট কিন্তু স্বদেশি করা যে ভয়ের ব্যাপার তাও জানতুম। এই আন্দোলন বিপজ্জনক, এ থেকে দূরে থাকতে হবে, এই ছিল তখনকার শিক্ষা। স্বদেশি বই, নেতাদের ছবি, স্বদেশি গান এ বাড়িতে প্রবেশ করেনি।

এই সময়টায় বাবা কাটিয়েছেন মফঃস্বলে যেখানে আন্দোলনের তীব্রতা কিছু কম। দূর থেকে দেখেছেন এই নতুন জাগা জাতীয় বন্যাকে, একটা অজানা ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছেন, কিন্তু এই আমাদের একমাত্র পথ, সকলকেই এই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে, এই চিন্তা জাগেনি মনে।

কলেজ জীবনে ও পরবর্তী জীবনে ইংরাজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু বিদেশি চিন্তাকণা বাবার মনে প্রবেশ করেছে। ইংরাজ লিবারেলদের ভাবধারা উপর উপরে স্পর্শ করে গেছে বাবার মনকে। তার ফলে পরিবারের আর সকলের চেয়ে বাবা কিছু স্বতন্ত্র হয়ে গড়ে উঠেছেন।

আরেকটি প্রভাব বাবার জীবনে কাজ করেছে, সে বিবেকানন্দ। বাবা ছিলেন দর্শনের ছাত্র। ঈশ্বর কী? এই সৃষ্টি কেন? ইত্যাদি বৃহদাকার প্রশ্ন বাবার মনেও এসেছে কিন্তু কোনও উপলব্ধির পথ উনি খুঁজে পাননি। এই প্রশ্নধারার মৃত্যু ঘটেছে বহুদিন। ইংরাজি সাহিত্যের সংস্পর্শে মন কিছু সম্পদশালী হয়েছে কিন্তু সেই সম্পদ সংরক্ষণ করবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য ওঁর নেই। সুন্দর ভাবকে প্রশংসা করেন, হয়ত অনুভবও করেন তার গভীরতা কিন্তু এই অনুভূতির ক্ষণস্থায়িতা ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধিকে সাহায্য করেনি।

আজ যখন ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘনিয়ে আসছে তখন জাতীয় সরকারের ভক্ত হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হয়নি। আজকের সরকার ভারতের উচ্চ শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক তাই নূতন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা যাতে আমাদের পরিবার পায় তারই চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আমাদের সমাজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোন পথে এই সমাজ এগোবে? আমাদের জাতীয় উন্নতি, যার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কোন পথে হতে পারে তা নিয়ে গভীর চিন্তা করবার অবকাশ ওঁর নেই। আজীবন অর্থোপার্জন করে পরিবারকে সেবা করেছেন। এখনও তাই করছেন, শুধু তাঁর পরিবারবোধ আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে নিজ পরিবারে [= স্ত্রীপুত্রকন্যার গণ্ডিতে] সীমাবদ্ধ হয়েছে।

কলকাতা
২২ ফেব্রুয়ারি।

একটা ভাঙাচোরা পৃথিবীতে বাস করছি। কোনও বিষয়ে কোনও স্থিরতা নেই, কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে যেদিকে পারে চলেছে, যে যেমন ইচ্ছে নিয়ম গড়ছে। আজকের দিনে আমাদের কোনও একটি মাত্র নিয়ম প্রচলিত নেই। বহু পথ, বহু পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। সমাজের বাঁধন অতি দ্রুত শিথিল হয়ে পড়ছে তারই লক্ষণ এসব। দারিদ্র্যের করাল পটভূমিকা জাতির জীবনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। মানুষে মানুষে যে প্রচলিত সম্বন্ধ এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তাতে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। খাদ্যবস্তু থেকে আরম্ভ করে জীবন ধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর অভাব ঘটেছে আমাদের দেশে। পরাধীন, দরিদ্র দেশের অর্থই তাই। এই অবস্থা থেকেই আজকের দিনের অসন্তোষ ধুমিয়ে [তথৈব] উঠছে। এমনি করে কতদিন চলে, এমনি অভাবের মধ্যে?

অর্থের সন্ধানে, উপজীবিকা সংগ্রহের তাগিদে মধ্যবিত্ত ঘর ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। পুরোনো যুগের নিশ্চিন্ত, নির্বিকার ভাব আজ কেটে গেছে, চারদিকেই অনিশ্চয়তা, চারদিকেই অশান্তি। কেন এই অশান্তি? মূল কারণ দারিদ্র্য। পুরোনো যুগের বিদ্যা অর্থকরী নয়, নতুন যুগের উপযোগী শিক্ষা আমরা পাই না, অথচ বাস করি নতুন অবস্থার মধ্যে, এইখানেই সব অশান্তির মূল। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জগতের সামঞ্জস্য নেই, এইখানেই ভাঙাচোরা সমাজের আসল রোগের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমন কোনও যুগাবতার আজ নেই যিনি নতুন যুগের বাণী শুনিয়ে নতুন পথে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। নানা মুনির নানা মতের ঘূর্ণিপাকে বাঙালি মন উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে আজ আদর্শের সংঘাত, শিক্ষার বিরোধ, মতের অনৈক্য, পথের অমিল। পুরোনো আদর্শ অনুযায়ী পরিবার

আর টিকতে পারছে না আজকের আবহাওয়ায়। পাশ্চাত্য চিন্তা দেশি আদর্শকে আঘাত করে প্রবল বেগে, তার উপর দেশের দারিদ্র্য, এই দুই শক্তির প্রবল তাড়নায় মধ্যযুগীয় আবহাওয়া অতি দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। কিন্তু নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আজও দুর্বল, আজও সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। পুরোনো আদর্শে বিশ্বাস নেই এমনি নরনারী সংখ্যায় বহু কিন্তু কোনও নতুন আদর্শকে বরণ করেছে এমনি মানুষ নিতান্তই অল্প।

সেই অল্পসংখ্যক মানুষের শ্রেণিতে নিজেকে ভর্তি করেছি। আমার জীবনপথের সাথিদের এই শ্রেণি থেকেই খুঁজে নিতে হবে। যারা বর্তমান সমাজের আবহাওয়াকে বিষাক্ত বলে জানতে শিখেছে, যারা নতুন উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা রাখে, যারা সেই সমাজকে জন্ম দেবার জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে রাজি, ধীরে ধীরে তাদেরই শ্রেণিতে আমি স্থান করে নিতে চলেছি। কী আমার আদর্শ? সেই আদর্শে পৌঁছোবার কোনও সুনির্দিষ্ট পথ আছে কি? আমি কি সেই পথের সন্ধান পেয়েছি? সেই বিপদসঙ্কুল পথে চলবার সাহস ও উদ্যম আমার আছে কি?

আমার আদর্শ এমনি একটু সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণ বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করতে পারবে; যেখানে জীবন ধারণের উপযুক্ত সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে মানুষকে সব সময়ে নিযুক্ত থাকতে হয় না; যেখানে মানুষের মধ্যেকার নিরর্থক বাধাগুলি অপসারিত হয়েছে। কথাগুলি অস্পষ্ট কিন্তু তবু এই আমার লক্ষ্য।

কেমন করে সম্ভব হবে এই সমাজকে সৃষ্টি করা? যারা নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক তাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করবে এই সমাজ। নতুন যুগের মানুষদের সংঘবদ্ধ করবার নানান প্রচেষ্টা চলছে বর্তমানে। আমার ব্যক্তিগত জীবনকে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে দেব। একমাত্র এই যোগের মধ্য দিয়েই আমার উপলব্ধি পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে; এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

কীভাবে যুক্ত করব নিজেকে? কতটুকু ক্ষমতা আছে আমার অন্যকে চালনা করবার, অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার করবার? অতি অল্পই। সমাজকে দেবার মতন বিদ্যা আমার নেই। তবু বাঁচবার উদ্যম আছে আমার মধ্যে। বাঁচবার ইচ্ছা অনিবার্যভাবে আমাকে ঠেলে দেবে ওই পথে। আমার সামনে দুটি পথ—দ্রুত উন্নতি অথবা মৃত্যু।

নতুন সমাজের আবহাওয়ায় বাস করবার যোগ্যতা কি সত্যিই অর্জন করেছি? পুরোনো যুগের অভ্যাস তো আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যৌনচিন্তার অস্বাস্থ্যকর জ্বালা আজও আমাকে অধিকার করে রয়েছে; বলিষ্ঠ জীবন সৃষ্টি করবার উদ্যম আজও আমার মধ্যে জেগে ওঠেনি; চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রকাশের ক্ষমতা আজও আমার আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। মাঝে মাঝে মনে হয় অতি দ্রুত অধঃপতনের দিকে চলেছি, উদ্যম নেই, আগ্রহ নেই, আরামের আফিং খেয়ে পড়ে আছি। আমার চারপাশের অবস্থাকে এই সময়ে মেনে নিই, পরিবর্তনের ইচ্ছা ক্ষীণ হয়ে আসে। এই বিপজ্জনক রোগের হাত থেকে মাঝে মাঝে অনায়াসে মুক্তি পাই। মুক্তি পাই কাজের মধ্যে দিয়ে, নিরলস আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। জীবন্ত বন্ধুদের স্পর্শে আবার ফিরে পাই নতুন জীবনের আস্বাদ। আরও একটি শক্তি আমায় রক্ষা করে, সে আমার প্রেম। ওর জীবনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, সে কর্তব্যকে পূর্ণ করতে না পারলে মিথ্যা আমার ভালবাসা, আমার

সব ব্যবহার আরামপ্রিয় মনোভাবের ছলনা। প্রবল ধাক্কায় সচেতন হয়ে উঠি—বিশেষ করে যখনই দুজনের সামনে কোনও সমস্যা দেখা দেয়।

তবু আমার মধ্যে দুই যুগের দ্বন্দ্ব রয়েছে, এ দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, এর যথার্থ সমাধানের মধ্যেই আমার ভবিষ্যৎ রয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি।

একটা কাজ হাতে নিলেই মনে হয় অমুক কাজটা আগে করি, এটা এখন থাক। নিষ্ক্রিয় মনোভাবেরই লক্ষণ এটা। স্থিরচিত্তে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোনও কাজ করবার ক্ষমতা যেন লুপ্ত হতে চলেছে। অস্থিরতার আরেকটি প্রকাশ উগ্র আত্মসচেতনতা। কোনও চিন্তা মনে এলেই, আমি এই চিন্তা করছি এই কথাটাও মনে এসে ব্যাঘাত ঘটায়। আচ্ছা কীভাবে আমার চিন্তা করা উচিত, আমি কি ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারি, সবাই আমাকে লক্ষ্য করছে, আমার চিন্তা উঁচু দরের না হলে মহা লজ্জায় পড়ব—এমনি ধরনের প্রশ্ন মনে এসে স্বাভাবিক চিন্তার কাজ ব্যাহত করে। কোনও অনুভূতিকে সহজভাবে অনুভব করতে পারি না। সাথে সাথেই প্রশ্ন করি কেন এই অনুভূতি, বোধহয় অমুক কারণে এমনি ঘটছে, আর সত্যিই কি গভীর করে অনুভব করছি, না চিন্তা করছি যে অনুভব করতে পারলে মন্দ হত না। এই তীব্র আত্মসচেতনতা আমার মনের অখণ্ড ঐক্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে আমি এগোতে পারছি না। আমার পড়াশোনা, আমার বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, আমার কাজ করবার উদ্যম—সকল ক্ষেত্রেই এই আত্মসচেতনতার বিরক্তিকর অভিযান চলেছে। সব ভুলে গিয়ে কোনও একটি বিষয়ে নিমগ্ন হয়ে যাবার যে আস্বাদ সে আমি বহুদিন পাইনি। একটি জিনিস আমাকে বেশ সাহায্য করে—মনঃসমীক্ষণ। রোজ সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘরে বসে স্থির হয়ে নিজেকে অনুভব করতে চেষ্টা করি। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা গভীর শান্তি ও একটি নিগূঢ় শক্তির সন্ধান পাই।

আরেকটি চিন্তা আমার মনোরাজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে—আমার পরিবারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। আজও স্থির করতে পারিনি পরিবারের প্রতি আমার কর্তব্য কতটুকু। একথা নিশ্চিত সত্য যে পরিবার আমার কাছ থেকে যা চায় তা আমি দিতে পারব না অর্থাৎ অনেকটাই দেব না। সেকথা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন আসছে একেবারে কিছু দেব না এমন হতে পারে কি? পরিবার প্রত্যাশা করে যে আমি পরিবারের পূর্বপুরুষের ধারা অব্যাহত রেখে, সুবোধ বালকের মতন পাঁচজনে যা করে তাই করে, পিতামাতা, ভাইবোনকে সেবা করে, তাঁদেরই নির্দেশমতন সংসারধর্ম পালন করে জীবন কাটিয়ে দিই। এই কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে আমাকে বিনয়ী, বাধ্য ও সেবাপরায়ণ হতে হবে, যেকোনও উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে হবে ও পরিবারের উপকারার্থে তা ব্যয় করতে হবে। দেশে যাতে আমাদের বংশের সুনাম হয় তার আয়োজন করতে হবে, উচ্চ বংশের সঙ্গে যোগস্থাপন করে পরিবারের সামাজিক মর্যাদা আরও বাড়াতে হবে।

আমি কোনওমতেই এই পথে চলব না। বিনয়ী হতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু বাধ্য ও সুবোধ বালক হতে আমার গুরুতর আপত্তি আছে। পূর্বপুরুষের নীতিকে আমি পদে পদে লঙ্ঘন করব,

আর পাঁচজনের মতন সংসারধর্ম পালন করে পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই। প্রচুর অর্থ উপার্জন আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তাছাড়া যেকোনও উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে আমি প্রস্তুত নই। পরিবারের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

আমাদের পরিবার নতুন সমাজের পথে এগিয়ে যেতে চায় না, পুরোনো যুগের শিক্ষার প্রভাব এ পরিবার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্বদেশি আন্দোলন, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রবীন্দ্রসংস্কৃতির নূতন ধারা এর কোনওটির সাথেই আমাদের পরিবারের নাড়ীর যোগ নেই। এমনকি চিন্তাজগতেও এই আন্দোলনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই তিন ধারা যে নতুন সমাজের দিকে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমিও সেই সমাজে পৌঁছোতে চাই, তাই এই ধারার সঙ্গে নিজেকে আমি যুক্ত করেছি ও ভবিষ্যতে এই যোগকে আরও সত্য করে তুলব। এই পথে আমার পরিবারকে আমি নিয়ে যেতে পারি না কি? সম্ভবত না। জ্যাঠামশায়, জ্যেঠিমা, বাবা, মা, ছোটোকাকা, কাকিমা, বড়দা, বৌদি ও মেজদা পুরোনো সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রয়েছেন। সেই সমাজে ভাঙন ধরলেই এঁদের প্রতিবাদ শোনা যায়, নতুবা নয়। তাছাড়া যে আত্মীয়মণ্ডলীর সাথে এরা বহু বন্ধনে আবদ্ধ সেখানে প্রগতিশীল মানুষ নেই, সেই মণ্ডলীর বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সাহস এদের নেই। এ অবস্থায় আমার একার প্রচারে কতটুকু ফল হতে পারে?

আমি যদি কোনওদিন এই বন্ধন ভেঙে এই মৃত্যুর গণ্ডির বাইরে গিয়ে নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পারি তবেই আমার কথা এরা মনোযোগের সাথে শুনবে কিন্তু তাতে কতটুকু ফল হবে জানি না। ফল হোক আর নাই হোক এই বন্ধন আমি ভাঙবই, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে আমি রক্ষা করবই।

যাদের সাথে আমার জীবনকে যুক্ত করেছি তাদের সাথে বাস্তব জগতে চলতে হলে পরিবারকে আমার ছাড়তেই হবে। হয় আমার নবীন বন্ধুর দল নয় আমার জীর্ণ পরিবার—এই দুই পথের মধ্যে আমাকে বেছে নিতেই হবে। আমি প্রথম পথ বেছে নিয়েছি।

এই পথ বাছবার অধিকার আমাকে কে দিল? যাদের অর্থে আমার ভরণ পোষণ হয়েছে, যাদের সেবায় আমি বেঁচে আছি, তাদের সঙ্গে এক কথায় বিচ্ছেদ ঘটাতে কি আমি পারি? তারা হয়তো আমার কর্মজীবনে বা চিন্তার জীবনে কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে চাইবে না। তারা হয়তো আমার কাছে শুধু ভরণপোষণ দাবি করবে। কী উত্তর দেবার আছে আমার? ভরণ পোষণের দাবি হয়তো আমি প্রত্যাখ্যান করব না কিন্তু তাদের জীবনে সর্বতোমুখী সহযোগিতা করতে আমি পারব না।

কিন্তু আমি কি ইচ্ছা করলেই স্বতন্ত্র পথে চলতে পারি? পথ বেছে নেবার যোগ্যতা বা অধিকার বলে কি কোনও বস্তু নেই? আমি কি দেশের কাজে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করেছি যার জোরে আমি বলতে পারি যে তোমাদের সংসর্গ আমি ত্যাগ করব? আমি কি নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে কোনও অবদান রেখে যেতে পেরেছি যার নজির দেখিয়ে আমি স্বতন্ত্র পথে চলবার দাবি

করতে পারি? এমনকি বিদ্যাশিক্ষা করবার যে সুযোগ আমি পেয়েছি, আলস্য কাটিয়ে তারই কি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে আমি পেরেছি? তবে নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেব?

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে আমি স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার শিক্ষা পাইনি। বহুদিন ভয়ে ভয়ে এসব থেকে দূরে থাকতে থাকতে কেমন একটা সঙ্কোচ ও হীনতাবোধ এসে গেছে, আজ আর প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারি না। তবু আজ আমি বহু দ্বিধা, সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আজ এই ধরনের কোনও আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে বিচিত্র নয়। পড়াশুনায় অমনোযোগী ছেলে, ভালোছেলের সাথে একসাথে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ হতে পারিনি। তাই আমার চরিত্রগঠনে ও শিক্ষায় অনেক বড়ো বড়ো ফাঁক রয়ে গেছে। তবু আজ যেন নিজেকে গড়ে তুলবার কাজে লেগেছি, অম্লান, হরিদাস, রঞ্জিত ইত্যাদি সবল প্রাণের সঙ্গে যোগস্থাপন করে নিজেকে সৃষ্টি করছি। নতুন করে বাঁচবার মূল প্রেরণা এসেছে আমার বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। একটি পথ ধরে আমি এগিয়ে চলেছি। এ পথ পরিবারের নির্দিষ্ট পথ নয়। যেখানেই গিয়ে পৌঁছোই এই পথ ধরেই আমি চলব, অন্য উপায় নেই। দ্রুত আমার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারি তাই হোক আমার একমাত্র চিন্তা, পরিবার ছাড়বার কৈফিয়ত এই সাধনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

1.3.47
South Calcutta

I was filled with life this evening. Love surged up and filled me to the brim. [...][১২]
I was caught up in a mad frenzy of boundless joy. For the moments I lost myself in it. I could not resist myself. It is long long since I felt such a turmoil within me. Oh, how I have hungered for it!
It came this evening. And the glorious part of it was that she was with me to share my experience. I poured myself out to her. I broke into a song. [...] The two hearts mingled and there was no barrier between us. It was a true embrace of love. Oh how I have longed to open my heart to her like that. I spoke like a king who has conquered the heart of his queen!
She raised her brilliant eyes to mine. Those eyes confessed. It was a confession of love. Oh how I have longed to light up her eyes with that lustre of love!
As I spoke to her of my experiences I trembled with a mysterious sense of joy. All doubts vanished, all pettiness disappeared.
I felt a freedom that can be rarely experienced. It was an experience of supreme self-confidence. Once more I discovered that I am large and powerful, I am great and noble. I raised my precious companion to that height. Oh how glorious was her response! She is a treasure, a rare jewel. She is full of colour and music. The powerful pull of my love recovered her real self from the prison-house of the thousand nothings of daily life. She unfolded her true and richest mind. It held my mind in that never-ending embrace.
These are the moments when I rediscover myself, when I regain my lost courage. These are the moments when I can iose myself in a frenzy of creation. These again are the moments when the dark screen is lifted and the world of light – the world

of colours and music – enraptures me. When I speak like that I reveal my deepest self. When I feel like that I experience truth itself – an experience which I value greater than anything else in the world.

কলকাতা

১ মার্চ।

যে প্রেম ঝরনার মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তার গতিবেগ প্রশমিত হয়ে আসছে। কিন্তু তবু আজকের সন্ধ্যা আমার জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ধ্যা। আজ বলতে পেরেছি আমি ভালোবাসি শুধু তাই নয় ঠিক যেমনি করে বলতে চাই তেমনি করেই বলতে পেরেছি। আমার সমস্ত প্রাণ আজ মুখর হয়ে উঠেছিল এক অপূর্ব সঙ্গীতে। ওর আঙুলগুলি মুঠোয় চেপে ধরে যে কথা ওর কানে বলেছি সেই আমার চরম সত্য ওর বেশি আর কোনওদিন হয়তো বলতে পারব না, হয়তো বা অমনি সুন্দর করে আর সৃষ্টি করতে পারব না আমার ভালোবাসাকে। ও স্থির হয়ে শুনল, আশ্চর্য সুন্দর চোখদুটি আমার চোখে রেখে আশ্চর্য দৃষ্টিতে চাইল। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাকে যেন চিরদিন এমনি মহান করে প্রকাশ করতে পারি এমনি শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এমনি গভীর আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠে। ওর সাহচর্য মধুর করে তোলে আমার ভাষাকে, সুর মিলিয়ে দেয় আমার কথায়। ওর স্পর্শে আমি যেমনি করে জেগেছি, ওর আলিঙ্গনের উত্তাপ আমার মনের সুপ্ত সৌন্দর্যকে যেমন করে মেলে দিয়েছে এমনটি কি আর হতে পারত? ওকে ভালোবেসেছি, ওর মধ্য দিয়ে ভালোবেসেছি জীবনকে এই অপূর্ব বেঁচে থাকাকে। সেই কথাটি, সেই পরমাশ্চর্য সত্যটি আজ আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছি, আজ আমি পবিত্র হয়েছি। জীবনদেবতার উদ্দেশে আজকের সন্ধ্যা আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বহন করে নিল। আজকে হাতে হাতে যে বাঁধন দৃঢ় হয়ে উঠল সারাজীবন সে বাঁধন যেন শিথিল না হয় এতটুকু। চিরদিন যেন এমনি গর্বে বলতে পারি "তুমি আমার, তোমায় নইলে আমি অসম্পূর্ণ"। এমনি ছন্দোময় ভাষায় যেন চিরদিন আমার প্রেমকে রূপ দিতে পারি। এমনি গভীর অনুভূতি যেন চিরদিন আমার প্রতিটি অণু পরমাণুতে কাঁপতে থাকে।

কলকাতা

৭ মার্চ ১৯৪৭

নিজের স্বভাবের অনেক ত্রুটি ধরা পড়ছে। এগুলি কোনওদিন কাটিয়ে উঠতে পারব কিনা জানি না কিন্তু সংশোধনের আগে ত্রুটিগুলিকে স্পষ্ট করে জানা দরকার, কোথা থেকে এর উৎপত্তি তাও জানতে হবে বিশ্লেষণ করে।

কিছুদিন পর পর একটা রোগ দেখা দেয় আমার শরীরে—গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শরীর মন। বেঁচে থাকার সব আগ্রহ যেন নিভে যায়, শুধু দিনের পর দিন ঘুমিয়ে দিন কাটাই। কোনও কিছুর আকর্ষণই আমাকে এই সর্বনাশা নাগপাশ থেকে বাঁচাতে পারে না। এই সময়টায় দুটি উপসর্গ জোটে। প্রথমত যৌন কল্পনার আধিক্য, দ্বিতীয়ত আত্মধিক্কারের গ্লানি। নিজের উপর সামান্য বিশ্বাসও থাকে না। বন্ধুদের আশ্রয় থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চাই। মনে হয় শুধুমাত্র ফাঁকির উপর বেঁচে আছি আমি, আমার বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। আমি কিছু জানি না, আমার কোনও করবার সামর্থ্য নেই, কোনও দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত নই

আমি—ইত্যাদি নানা চিন্তা আমাকে অস্থির করে তোলে। ভাবি আবার কি ফিরে পাব আমার শক্তি? আবার কি কোনওদিন মানুষের মতন উঠে দাঁড়াতে পারব? না এমনি করে বার বার ভেঙে পড়ব জীবনের যাত্রাপথে? আজ না হয় আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে আছি। ভবিষ্যতে কেমন করে আমার চলবে? আমার স্বতন্ত্র জীবনে নিজের শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বকে পারব কি আমি রক্ষা করতে? সংশয়ের আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। আবার মনে হয় এমনি করে আত্মবিলাপ করেই কি আমার জীবন কাটবে? কী লাভ এই আত্মধিক্কারে? সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে এই বিলাপ কি কিছুমাত্র সাহায্য করে? হয়তো এ আমার স্বভাব। হয়তো এমনি করে বার বার ভেঙে পড়ব আর এমনি করে সেই সময়কার বিলাপের চিহ্ন রেখে যাব এই ডায়েরির পাতায়। হয়তো বা এ আমার বিলাস। তবু লিখে রাখি। আর কিছু না হোক একটা যেন মুক্তির আস্বাদ পাই। মনের পুঞ্জীভূত গ্লানি দুর করবার এই হল শ্রেষ্ঠ উপায়।

যেদিন থেকে ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়েছি সেদিন থেকে একটা দৃঢ় কর্তব্যবোধ আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তুলেছিল, গতিশীল হয়ে উঠেছিল আমার জীবন। আজ ভয় হয় বুঝি বা সেই গতি স্তিমিত হয়ে এসেছে। আবার বুঝি পুরোনো দিনের রোগ আত্মপ্রকাশ করছে। আবার বুঝি পঙ্গু হয়ে থাকবার দিনগুলি ফিরে এল। আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠি। তবে কি মৃত্যুর হাত এড়িয়ে যাবার কোনও পথই নেই? এ পরিবারের সচ্ছল অবস্থা, আরাম আর নিশ্চিন্ত মনোভাব আমার মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, চিন্তায় চঞ্চল করে তোলে না, কাজে উৎসাহ দেয় না। এ আমার মৃত্যুপুরী। কেমন করে এর প্রভাব থেকে মুক্তি পাব তাই ভাবি কিন্তু ভেবে কোনও কুল পাই না।

হরিদাস, রঞ্জিতদা, অম্লান এরা আমার পথপ্রদর্শক। একটিমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা আমাকে রক্ষা করতে পারে—সে আত্মপ্রকাশের সাধনা। নিজেকে শুধু প্রকাশ করতে চাই সুন্দর করে, অন্য অভাব আপনি পূর্ণ হবে।

কলকাতা
১৪ মার্চ।

হরিদাস কাজ দিয়েছে অনেক। সবসময়ে সকল চিন্তার পিছনে এই বোধটা জেগে রয়েছে যে কাজ করছি না, অন্যায় করছি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি ক্রমাগত এই বোধটা অনুভব করি যে এ বাড়ি আমার বাড়ি নয়, এদের সঙ্গে বেশি মিশব না, আমার স্বাতন্ত্র্যকে জাগিয়ে তুলব ফুটিয়ে তুলব। ভাবি এরা আমার উপর নির্ভর করে আছে অথচ আমি তো এদের ভার নেব না। সেকথা কি ওদের জানিয়ে দেওয়া উচিত? যদি জানাই তাহলে হয়তো আমার আশ্রয় ঘুচে যাবার আশঙ্কা আছে। তাই ঠিক করেছি যে এক বছর পরে ওদের আশ্রয় ছেড়ে বাইরে যাব, তখন জানালেই হবে। অনেকবার অসতর্ক মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মিশে যাই আবার সচেতন হয়ে সরে আসি। ভাবি আমার আদর্শ সম্বন্ধে আমি তেমনভাবে সচেতন নই, নইলে এই পদস্খলন হয় কেন।

এই ধরনের চিন্তায় কিছুদিন ধরে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। জীবনকে অনুভব করিনি বহুদিন। ওর ডায়েরি প্রতিবার আমার মনকে মুক্ত করে দেয়। এবারকার ডায়েরি পড়ে বুঝলাম কত সময় ওর কত কথা আমি বুঝিনি। কত জীবনচঞ্চল ওর মন। কত সুন্দর অনুভূতি দিয়ে গড়া।

জীবনের অভিজ্ঞতা ওর সঞ্চিত হচ্ছে দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত। আকণ্ঠ পান করছে ও জীবনের আনন্দ। আর আমি? আমার অনুভূতির কাজ যেন শেষ হয়ে গেছে, কল্পনা থেমে গেছে, শুধু হিসাব করাই আমার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি আমাকে এতদিন ও কেমন করে সহ্য করেছে। ওর কোনও অনুভূতির এতটুকু অংশও তো গ্রহণ করতে পারিনি আমি। শুধু দিনরাত শত্রুর আক্রমণের ভয়ে যুদ্ধের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছি। কিন্তু যার জন্যে এই আয়োজন সেই মূল বস্তুটিকেই হারাতে বসেছিলাম। কী কথা বলেছি ওর সঙ্গে, ওর মনকে তো কিছুই বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি কেন অমনি করে আকুল হয়ে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে। এতদিন ধরে আমার কথায় শুধু কতকগুলি যান্ত্রিক কথা শুনেছে—বন্ধুর সংখ্যা বাড়াও, বাস্তববোধ বাড়াও, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হও ইত্যাদি আরও অনেক ফরমাস। ওর সুন্দর অনুভূতিগুলি আমার কাছে একটুও সমর্থন পায়নি, উল্টে খালি উপদেশ শুনেছে। দুঃখ হবে না ওর? ও ভেবেছে ওর কল্পনা ওর দোষ, ওর বাস্তববোধের অভাব ওর এক অমার্জনীয় ত্রুটি, আমার চাহিদা ও মেটাতে পারে না—এইসব ভেবে ভেবে ও গভীর দুঃখ পেয়েছে। বার বার ওর মনে হয়েছে ওর মনকে আমি চিনলাম না, ওর সুন্দর মনকে স্বীকৃতি দিলাম না আমি, একটু বললাম না ওর চোখের উপর চোখ রেখে তুমি সুন্দর, তোমার কল্পনা সুন্দর, যে আনন্দ তোমার অনুভূতির মাঝে কাঁপছে সেই আনন্দ সুন্দর। শুধু নিত্যনতুন চাহিদা দিয়ে ওকে অস্থির করে তুলেছি।

আমি বোধ হয় মৃত্যুর পথে চলেছি ধীরে ধীরে। নইলে আমার কাজকর্মে এতখানি শিথিলতা কোথা থেকে এল? আমার অনুভূতির ক্ষমতা সতর্ক বুদ্ধির অতিচর্চার আড়ালে চাপা পড়ে রয়েছে, ওকে চিনবার জানবার যে তীক্ষ্ণ ক্ষমতা আমার ছিল সে ক্ষমতা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন ওর প্রতিটি অনুভূতি আমার মনে প্রতিধ্বনি তুলত যখন ওর প্রতিটি চিন্তা আমার চিন্তাকে নাড়া দিত। সেই দিন বুঝি বা অতীতে ফেলে এসেছি। সেই যোগসূত্র বুঝি বা হারিয়ে ফেলেছি। নইলে এমন নির্বিকারভাবে যেকোনও অবস্থাকে বেশ মেনে নিই কেন? কেন আমি পাগল হয়ে যাই না ভিতরকার অস্থিরতায়? ওর চোখের জল নিজেই মুছে ফেলল, বলল, এ আমার দুর্বলতা, তুমি কিছু মনে কোরো না। কত বড়ো দুঃখে অমনি করে বল্ল সে কি আমি বুঝেছি? অমনি করে চোখের জল ফেলল আর আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম, কিছুই বললাম না, এমন তো কোনওদিন হয়নি, এ কেমন করে হল?

কতদিন ওর লেখা পড়ে আমি বুঝেছি যে আমি ওর আনন্দের সত্যিকার সাথি নই। আমার দুর্ব্যবহারে ও যখন কষ্ট পায় একমাত্র তখনই আমি ওকে বুঝি, তার আগে নয়। ওকে যখন আমি কাঁদাই একমাত্র তখনই ওকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পাই। তাই যদি না হয় তবে এতদিন ওর মনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে কেমন করে ছিলাম আমি? আবার যেন সেই যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি। কোনও দেবতায় বিশ্বাস করি না আমি। তবু প্রার্থনা করি আর যেন ওকে এমনি করে না হারাই। একমাত্র ওকে কেন্দ্র করে আমি বেঁচে আছি এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু নেই। ওর সুন্দর মনকে জয় করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু, আজ আমাদের দুটি মন বহু শাখা দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে, এ মনকে খণ্ডিত করা শক্ত। তবু আমার মধ্যে যখন

মৃত্যু আসে তখন আর সব কিছুর সঙ্গে ওকেও বিস্মৃত হই। এত বড়ো নিষ্ঠুরতা ও কি বোঝে না? ও কেমন করে সহ্য করে এই ব্যবহার।

আমি যে কত সাধারণ মানুষ সে ওর লেখা পড়ে বুঝি। ওর সম্পদে ভরা মন কত বিচিত্র সম্ভার সাজিয়ে রেখে যায় ওর আত্মপ্রকাশের প্রতিটি স্তরে, কত বিচিত্রভাবে অনুভব করে ও জীবনকে। আর ওর লেখা পড়তে পড়তে নিজের মনের দৈন্য হঠাৎ ধরা পড়ল। আমি কী করেছি এই ক'দিন? পরীক্ষার চিন্তা, ভবিষ্যতের অর্থচিন্তা, সামাজিক সমালোচনার প্রস্তুতি সব কিছু আমাকে দ্রুত অমানুষ করে তুলেছে। ওর কাছ থেকে কত দূরে ছিটকে পড়েছিলাম আমি। আবার কি পারব ফিরে যেতে? আমার এই দৈন্য ওর কাছে ধরা পড়ে যদি? আবার কি আমার হারানো সম্পদ ফিরে পাব?

১৩ এপ্রিল

আমার ডায়েরি লেখা থেমে এসেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় কী হবে ডায়েরি লিখে, ওই সময়টা আরও দরকারি কাজে লাগানো চলবে, ডায়েরি লেখা খানিকটা বিলাস বই তো আর কিছু নয়? সত্যিই কি তাই? এ কি শুধু বিলাস না আত্মোপলব্ধির প্রয়াস? হয়তো কোনওটাই নয়, নিছক আত্মপ্রকাশ, তাতে আত্মোপলব্ধি হোক আর নাই হোক আত্মতৃপ্তি ঘটে। সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে যে আত্মবিশ্বাস আসে আমার জীবনে তা আসেনি। পরাজয়ের পর পরাজয়ের আঘাতে নিজের উপর চরম অবিশ্বাসই আমার মনোজগতের বড়ো সত্য। এই অবিশ্বাস চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরে আমাকে অস্থির করে তোলে। এর সাথে লড়াই করে মাঝে মাঝে মুক্তি পাই, কিন্তু মূল কথা ঐ অবিশ্বাস। নিজের শক্তির পরিমাপ আমার জানা নেই, নিজের উপর আমি নির্ভর করতে পারি না—তাই অন্যের দায়িত্ব নিতেও এত দ্বিধা বোধ করি। ছোটোবেলা থেকেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলুম যে মানুষকে চালনা করবার ক্ষমতা আমার নেই, অনুসরণ করবার ক্ষমতা হয়তো আছে। তাই নেতৃত্ব কোনওদিনই কামনা করিনি, কোনও কাজেই নয়, চিরদিন ভিড়ের মধ্যে, সর্বসাধারণের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেয়েছি। মানুষের দৃষ্টি আমি সইতে পারি না, আমার এই সঙ্কোচবোধটা আজও রয়েছে। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করা ও উপলব্ধির পথে নিয়ে যাওয়া মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কোনও এক জায়গায় নিজেকে আমার প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, যেখানে নিজের পরিচয় প্রকাশ্যে দিতে কোনওরকম সঙ্কোচবোধ করব না। কয়েকজনের কাছে অন্তত নিজেকে মেলে ধরতে হবে। সেইটে আমি পারি। বহু লোকের সঙ্গে আমি কারবার করতে পারি না, বহু লোকের অভাব আমাকে দিয়ে মিটবে না। গান্ধি, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, নিজেকে বিস্তৃত করার প্রয়োজনেই অগণিত মানুষকে আকর্ষণ করেছেন, সেই জনসমুদ্রে তাঁদের গভীর ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ মুক্তি দিতে পেরেছেন। বিশাল ক্ষেত্র নিয়ে তাঁদের বিরাট আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। আমি সাধারণ মানুষ। নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে আমার জনতার প্রয়োজন নেই। অল্প কয়েকজনের মনে ভালোবাসার আলো জ্বালতে পারলেই আমি তৃপ্ত হব।

বহু সন্ধানে মনের মতন মানুষ মেলে, দেখা মিললেও জয় করার পথটি দীর্ঘ ও দুরূহ বলে মনে হয়। অম্লানকে আর ওকে পেয়েছি বহুদিনের প্রয়াসে। আমার জীবনপথে এই দুটি মানুষ আমার

সত্যিকারের বন্ধু। আমার ভাষা এরাই বোঝে, একমাত্র এদের কাছেই আমার মন সকল বাধা ভেঙে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমি জানি এদের নইলে আমার চলবে না। এরা আমার যত অভাব মেটাতে পারে এমন আর কেউ পারে না। আজও বাবার উপার্জিত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে আছি। আজ হোক, কাল হোক এই ভিত্তি আমি ত্যাগ করব। সেদিন আমার বাবা, মা, দাদা, আত্মীয়স্বজন এদের কারও সঙ্গেই আমার প্রাণের যোগ থাকবে না। নিছক প্রয়োজনের তাগিদে এদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যে এ পরিবারব্যবস্থাকেই ভাঙতে চাই। বাইরের জগতে যারা এদের বন্ধুস্থানীয় তাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি না। পরিবারের মধ্যেও যেভাবে এরা বাস করে, দিন কাটায়, তাকেও কিছুমাত্র সহ্য করতে পারি না। অথচ আমি চুপ করে থাকি। তার দুটি কারণ—প্রথমত, আমি অন্নবস্ত্রের জন্যে এ বাড়ির উপর নির্ভর করি; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে আমি এদের থেকে স্বভাবত যথেষ্ট উন্নত হতে পারিনি। দ্বিতীয় কারণটির জন্যে প্রথমটিও অনেক পরিমাণে দায়ী। আরও একটি কারণ আছে। আমি জানি পরিবর্তনের যত চেষ্টাই করি না কেন আমি যতদূর যাব এরা তার অনেক পিছনে রইবে তাই আমার সঙ্গে সামঞ্জস্য এদের কোনওদিনই হবে না।

কিন্তু আমি পরিবারকে ছাড়ব বললেই পরিবার আমাকে ছাড়বে না। আমার অভাব মিটল কিনা সেদিকে আমার পরিবার নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। কেননা আমার মধ্যে যে জাতীয় অভাববোধ রয়েছে সে অভাববোধ এদের কারও মধ্যেই নেই। এখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ ও আচরণ অপরের জানবার ও আলোচনা করবার অধিকার আছে। নিভৃত আশ্রয় কোনও মানুষই এখানে পাবে না। প্রত্যেকের মনের মধ্যে ভেঙে চুরে প্রবেশ করে তার স্বাতন্ত্র্যটুকুকে বিলুপ্ত করে সবার সঙ্গে সমান করে মিশিয়ে দিয়ে তবেই এদের শান্তি। আমি কোনওদিন বিদ্রোহ করতে, প্রতিরোধ করতে শিখিনি, তাই বাড়িতে যখনই থেকেছি তখনই ধীরে ধীরে বাড়ির মানুষের মতনই হয়ে গিয়েছি। আমার শ্রেষ্ঠত্ব, আমার সৌন্দর্য ধুলো-চাপা পড়ে গেছে। আবার হোস্টেলের অনুকূল আবহাওয়ায় বেশ বেড়ে উঠেছি। আমি লক্ষ করেছি একমাত্র অনুকূল আবহাওয়াতেই আমি এগোতে পারি, প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমার সবটুকু শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, নিজেকে গড়ে তুলবার সৃষ্টি করবার আর কিছু থাকে না। হরিদাস এমন একটি মানুষ যার জীবনে দ্বন্দ্বের আবহাওয়াই অনুকূল। লড়াই করে ধাপে ধাপে ও এগোয়, স্বাভাবিক ভাবে পথ চলা যেন ওর স্বভাবে নেই। আমার এখনকার ক্লান্তি এই নিঃশব্দ লড়াইয়ের ক্লান্তি। এ বাড়ির প্রতিটি আচরণকে আমি নিন্দা করেছি কিন্তু প্রকাশ করতে পারিনি। সেই নীরবতা আমায় ফিরে আঘাত করছে। আজ মনে হয় যেন নিন্দা করবার চেতনাও আমি হারাতে বসেছি, এই বিষাক্ত আবহাওয়াকে আমি স্বীকার করে নিতে চলেছি। তাই যখনই ও বলেছে যে আমার আগ্রহ আর নেই আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। এ বাড়ির ছেলেরা অমন সুন্দর করে ভালোবাসতে পারে না, ভালোবাসার জন্যে গভীর বেদনা বহন করতে পারে না। আমি যদি ক্রমশ এ বাড়ির ছেলে হয়ে পড়ি তাহলে মৃত্যু ঘটবেই আমার—এ অনিবার্য। সেদিন ও যদি বলে তুমি ভালোবাসা হারিয়েছ, আমি না বলতে পারব না। কিন্তু সেদিন বোধহয় জীবনকেও ভালোবাসতে ভুলে যাব। তাই যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ওর বাহুর মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছি, আশ্বাস খুঁজেছি, বার বার বলেছি তোমাকে আমার এখন সর্বক্ষণ চাই,

একমাত্র তোমার সঙ্গ আমায় বাঁচাতে পারে। কিন্তু কোথা থেকে পাব সেই সঙ্গ—বর্তমান অবস্থায় আমরা যে বন্দী।

আমার আরেকটি আশ্রয় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক জাগরণ, নারীমুক্তির আন্দোলন। এই প্রবল স্রোতধারাবেগ আমার বুকেও মাঝে মাঝে জেগেছে, নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছে। সে এক তীব্র উত্তেজক সুরা যা পান করে নতুন ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলি, নতুন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখি। কিন্তু মনে মনে জানি এ হবার নয়, এ পথ আমার নয়। এই পথে আমার সঙ্গে রঞ্জিতদা, "স্বাধীনতা",[১৩] অমলেন্দু,[১৪] সুনীল—এরা।

সমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। যারা নির্বিঘ্নে বাস করতে চায়, শান্তি বজায় রাখতে চায়, ধীরে সুস্থে সংস্কার করে এগোতে চায়—আমাদের পরিবার সেই অঙ্গের অংশ। আমার ভিতরকার মেজাজটিও তাই। মোটামুটিভাবে বেঁচে থাকো এই হল আসল কথা। মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করো, দান ধ্যান করো, সৎকাজ করো, পরিবারের যশবৃদ্ধি করো আর ভালো থাকো এই হল এ পরিবারের ধর্ম। আজকের দিনের উচ্চ মধ্যবিত্তের ঘরে, যাদের মোটামুটি কিছু অর্থ সম্বল আছে তাদের মনোভাব মূলত এই। এই সমাজ নতুনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে, বিঘ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে এরা ভয় পায়। বাইরের জগতের পরিবর্তনের কথা এদের আতঙ্কিত করে তোলে, তাই চোখ বুঁজে থাকতেই এরা চান।

সমাজের নীচের তলায় অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। সেখানকার মানুষেরাই আনবে বিপ্লব। এরা শান্তি চায় না, কারণ সে বস্তু তাদের জীবনে নেই। এই অশান্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে তারা বেড়ে উঠেছে, ওই আগুন তারা সহ্য করতে শিখেছে শিশুকাল থেকে। ওই আগুনকে আজ তারা গ্রহণ করেছে তাদের বুকে, সেই আগুনে সমাজের উপরতলাকে ওরা জ্বালিয়ে দেবে। জীর্ণ প্রাচীনকে দাহ করবার দিন অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। বুদ্ধি দিয়ে জানি এই দাহকার্যে আমায় হাত লাগাতে হবে নইলে আমিও পুড়ে মরব। কিন্তু আমার মেজাজটি আজও আমার পরিবারের একটি ছেলের মতনই রয়েছে। আজও আমি এদের মতন আরামপ্রিয়, নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত আবহাওয়ার পক্ষপাতী। মনে মনে এও আশা করি যে শুধুমাত্র প্রচার কার্যের মধ্য দিয়েই দেশে বিপ্লব আনা সম্ভব।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। জানি না কোন পথে এগোব। শান্তির পথে পরিবর্তন আসবার পথ বোধহয় রুদ্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তন চাই এ জগতে তা নইলে বাঁচতে পারব না কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বিঘ্ন ডেকে আনতে সাহস পাই না। ঝড়ের হাওয়া পালে লাগাতে ভরসা পাই না। কোথায় গিয়ে যাত্রা থেমে যাবে জানি না, আজ প্রতিটি মুহূর্ত আমার পরীক্ষা চলছে, সঙ্কল্প বাক্যের দিন শেষ হয়ে গেছে।

১৫ এপ্রিল।

কিছুদিন ধরে পড়াশুনোর কাজ একেবারেই করতে পারছি না। অন্য কাজ যে বেড়ে গেছে এমন নয়। হাতের কাজগুলি কিছুতেই করা হয়ে উঠছে না অথচ আয়োজন সম্পূর্ণ। এই রকমই আমার হয়। কাজ না করার ব্যাধি আমাকে পেয়ে বসে। সব কিছু তৈরি শুধু একটা চিন্তা করে লিখে ফেলা বাকী সেইটুকুই চার পাঁচ দিন ধরে করে উঠতে পারলুম না। যখন ভাবতে বসি

বালিগঞ্জ

২ মে।

ইতিহাস যখনই পড়ি তাকে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। ইতিহাস পড়তে পড়তে মনটা আমার বেশ খুলে যায়, পুরোনো দিনের কাহিনি পড়তে পড়তে আধুনিক যুগের অনেক ঘটনা, আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরের অর্থটি বুঝতে পারি, অন্তত খানিকটা আঁচ করতে পারি। এইভাবে বুঝতে পারার ও চিনতে জানার প্রয়োজনীয়তাও যেমন তেমনি আনন্দও আছে।

সুশোভন বাবুর কাছে ইতিহাস পড়ে অম্লানের সঙ্গে আলোচনা করে আমার ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টি জন্মেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার উপরকার বৃহদাকার ঘটনাগুলি জানলেই ইতিহাস জানা হয় না। কী কী শক্তি মানুষের সমাজে পরিবর্তন আনে, কেমন করে যুগে যুগে বিভিন্ন বস্তু ও শক্তির সমাবেশের ফলে বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই প্রশ্নগুলি আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে মানবসমাজের উৎপাদন প্রথা বিবর্তিত হয়ে চলেছে সেই সাথে শত গ্রন্থি দিয়ে জড়ানো সমাজদেহটিকেও দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে। সমাজের অগ্রগতি মাপবার যে মাপকাঠি সেটা কার্ল মার্ক্সের কাছ থেকে পাওয়া। সেই দৃষ্টিতেই মূলত আমার ইতিহাস পড়া চলছে। আশা করছি ভবিষ্যতে কোনও দিন আরও উন্নত ও নির্ভুল কোনও দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাব।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে দেখি যে দেশে দেশে পরিবর্তনের লয় ভিন্ন। কোথাও দ্রুত তালে সমাজ এগিয়েছে যেমন ইংলণ্ডে, কোথাও বা পরিবর্তন এসেছে অতি ধীর গতিতে, জানান না দিয়ে, যেমন চীনে, ভারতবর্ষে। আজকের যুগে যখন ছড়িয়ে থাকা সভ্যতাগুলি এক জোট হয়ে গেছে তখন এগিয়ে পড়াদের তাগিদে অনগ্রসর দেশগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রথমে দেখা গেল এগিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছায় ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির অগ্রগতি রোধ করল। আজ দেখা যাচ্ছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার লক্ষণ। আজকের জগতে কোনও দেশই যে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নয় সে কথা সর্বস্বীকৃত। তাই আজ রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিশ্ব পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে।

কেমন করে আজকের পৃথিবীর সমস্যাগুলি দেখা দিল, আজকের পৃথিবীতে চীন, ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য কেমন করে তাদের বর্তমান সমস্যায় সম্মুখীন হল— এসব কথার উত্তর পাই আমার ইতিহাসের পাতায়। এই জানার যে আনন্দটুকু সবটাই পেয়েছি আমি কিন্তু আরও কতকগুলি দাবি আসে আমার সামনে যেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইতিহাস শেখা হয় না।

সামনেই পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকেও অনেকে আনন্দ পায়, আমি সে স্তরে উঠিনি। আমার কাছে আজও দুটি কাজ স্বতন্ত্র। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে লেখা অভ্যেস করা চাই। যেমন তেমন লেখা নয়, প্রশ্নের উত্তর লেখা। এই জিনিসটি এখন নতুন করে শিখছি। অধ্যবসায়ী ছাত্র কোনওদিনই ছিলাম না অথচ পড়াশুনো এড়িয়ে চলবার শিক্ষাটি পাকা হয়েছে। আজকে তাই পড়াশুনোয় মন লাগানো মানে সব সময়ে নিজেকে শাসনে রাখা। শুধু যে পাঠ্যপুস্তকেই অমনোযোগ ছিল তা নয়। বাইরের ভালো বইও যখন পড়েছি তখনও সুসংবদ্ধ চিন্তার অভ্যাস

করিনি। যেটুকু ভেবেছি, লেখার মধ্যে দিয়ে তাকে শোধন করবার চেষ্টা করিনি। আজকে এই চিন্তার সংযম ও প্রকাশের সাধনায় মন দিতে গিয়ে বারবার পুরোনো ফাঁকির কাছে পরাজয় স্বীকার করছি। লেখাপড়ার বাইরের জীবনটাও যে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছি তাও নয়। সেখানে শৃঙ্খলা বিশেষ ছিল না। একটা কথা আজ জেনেছি যে আমার শক্তির ভাণ্ড অতি সংকীর্ণ। তাই সারা জীবন মানুষের মতন বাঁচতে হলে একদিকে যেমন বিন্দু বিন্দু করে নতুন শক্তি আহরণ করতে হবে অন্য দিকে তেমনি অপচয় বন্ধ করতে হবে। শারীরিক শক্তির উৎস যেমন শরীরচর্চা বুদ্ধির জীবনীশক্তির উৎস তেমনি চিন্তার পরিধিকে বাড়িয়ে দেওয়া। চিন্তাকণিকাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করতে শিখলেই পরবর্তী ধাপের নতুন চিন্তা দেখা দেবে, নতুবা নয়। আমার ডায়েরির পাতায় পাতায় পুরোনো দিনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করব। আর নতুন সামগ্রী নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবার চেষ্টাও চালাব একই সাথে। প্রথমটি যেদিন সমাপ্ত হয়ে দ্বিতীয়টিতে এসে মিশবে সেইদিন শুরু হবে আমার মনোজগতের বিপ্লব।

আরও একটি কথা। নিজেকে শুধু প্রকাশ করলেই হবে না। এমন করে চিন্তাধারাকে রূপ দিতে হবে যা অপরের কাছেও বোধগম্য হবে এবং তার চিন্তাশক্তিকেও জাগিয়ে তুলবে। এমনি করে বহু হৃদয়ের স্পর্শে, নিজের হৃদয়টিকে আবার বাঁচিয়ে তুলব।

বালিগঞ্জ

১১ মে।

সকলে মিলে আমাকে ভালো বলে বলে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ফলে সব সময়ে ভাবি আসলে আমি ভালো। যার সঙ্গেই আলাপ হয় আমি যে ভালো এই কথাটা জানিয়ে দিতে চাই। কিন্তু একটা দোষ করে যখন স্বীকার করি তখন ভাবি কী ভালো আমি। অম্লান, ও, হরিদাস, এদের যখন ভালোবাসি নিজের ভালোত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা যেন বহুগুণ বেড়ে যায়। জ্যাঁ ক্রিস্তফ (তথৈব) পড়ে ভালো লাগল ভাবলুম আমি ভালো বলেই তো ভালো লাগল, আর কজন এমনি করে অনুভব করতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গ দিয়ে যখন আনন্দ দিই, যখনই একটা সুন্দর কথা বলি মনে মনে বারবার বলতে থাকি, "ইস কী ভীষণ ভালো আমি।" হরিদাসের কথায় আহত হয়ে জবাব দিই না, অনেক সহ্য করি আর ক্ষতিপূরণ করি আমি যে ভালো এই কথা স্মরণ করে। এমনি সব সময়ে।

আসলে এতে আমার ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। আগে তবু ভালো বললে প্রতিবাদ করতাম, আজকাল চুপ করে শুনি আর ভাবি এ তো আমার প্রাপ্য। কোনও কাজে সাফল্য হল না, ভাবি তাতে কী ওদের অনেকের চেয়ে আমি ভালো। এই অম্লানই যত নষ্টের গোড়া। ওর কথার মূল্য আমার জীবনে বেশ বেশি। ও-ই দিনরাত কানের কাছে মন্ত্র পড়েছে, যে আমি ভালো। ও আমাকে ভালোবাসে সেটা বুঝতে পারি, আমার কোনও কোনও দিককে অবজ্ঞা করুক তাও এক রকমের মন্দ না, কিন্তু এই যে সমালোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে কেবল কেবল ভালো বলে এতে আমার ক্ষতিই হচ্ছে। সমালোচনা যে একেবারে করেনি তা নয় কিন্তু কম, বেশি নয়, আর আমার কিসে উন্নতি হবে সে নিয়ে ওর এতটুকু চিন্তা নেই। হ্যাঁ একটি কাজ নিজে জোর করে করিয়েছে আমাকে, আমাকে বক্তৃতা দিতে শিখিয়েছে। এ ছাড়া আমার প্রতি ওর মনোযোগ কিছু কমই।

কাল বলল আমাকে নাকি ও খুব শ্রদ্ধা করে। আমাকে ও ভালোবাসে জানতাম আর আমি ওকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি জানতাম কিন্তু ও আমাকে শ্রদ্ধা করে এ খবরটা একটু নতুন লাগল। আমার মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মতন কী আছে জানি না। ও বলল যে ওর superiority complex ওকে শ্রদ্ধা করতে বাধা দেয় কিন্তু আমাকে আর রণবীরকে ও নিজের চেয়ে ছোটো করতে পারে না কিছুতেই। খুব আশ্চর্য লাগল শুনে। আমি কি এত ভালো? আমি যে কিছু ভালো তা জানতুম কিন্তু আমি যে ওদের মতন ছেলের চোখে বড়ো এই আমার জানা ছিল না। এ নিয়ে আর কথা বলতে আমার আর ইচ্ছে করে না কিন্তু সত্যিই বুঝি না কীভাবে আমি বড়ো হলাম ওর চোখে। অশোক, হীরেন, তপন, হরিদাস, রঞ্জিত, সন্তোষ,[১৫] এরা প্রত্যেকে আমার চেয়ে উন্নত, এদের ভবিষ্যৎ কত সুন্দর। কিন্তু আমি তো সব সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত। কখন নিঃশব্দে মরে যাব সেই ভয় করি। বাইরের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা আমার কত কম। বার বার টের পাই আমি কত সাধারণ ছেলে। সেই জানাই বোধহয় আমার ভালো ছিল। তাহলে নিজের জীবন নিয়ে খানিকটা সন্তুষ্ট হতে পারতুম। এদের মাপকাঠিতে নিজেকে বিচার করতে গিয়ে বার বার আঘাত পাই আর সঙ্কুচিত হয়ে সরে আসি।

নিজেকে একত্রিত করে গুছিয়ে তুলবার যদি একটু ক্ষমতাও থাকত তাহলে এই লাঞ্ছনা সইতে হত না।

কলকাতা

১৭ মে

খুলনা ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে যে ছেলেটি কলকাতায় এল কলেজে পড়তে তাকে বেশ মনে পড়ছে। কিশোর বয়সের লাবণ্যটুকু তখনও মুখের উপর লেগে রয়েছে। অনেকখানি ছাড়া পাবার ইচ্ছা আর ভালো হবার বাসনা নিয়ে সে এসেছিল। ম্যাট্রিক ক্লাসে বাবার কাছে ভক্তিযোগ বইখানা পাওয়া গেল। যৌন অসংযমের কুফল সম্বন্ধে সেই বয়সেই সচেতন হয়েছিলাম। বইখানায় সংযমের নির্দেশ খুব মনে ধরল। নিজের চেষ্টায় খানিকটা শুচিতা আনলাম মনে। বিবেকানন্দের বই থেকে লাইন মুখস্থ করতে শিখছি, ভক্তিযোগের তত্ত্ব বন্ধুমহলে কিছু কিছু প্রচার করতে শুরু করেছি। মনে পড়ে অনিলেশকে বলেছিলাম, "আচ্ছা তোমার রাগ হলে কী করো?", সে বুঝতে পেরে বলল, "ও, ভক্তিযোগ?" কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, কী করে নিজেকে restrain করতে হয় তাই লেখা আছে ও বইতে, ও বই সকলেরই পড়া দরকার।" বন্ধুমহলে সমর্থন মেলেনি কিন্তু তাতে উদ্যম হারাইনি। ছোটোবেলায় অসংযমে, বিনা কাজে দিন কাটিয়েছি, এবার আমি কর্মী হব, ব্যায়াম করে শক্তি সঞ্চয় করব, মানুষের মতন মানুষ হব, আদর্শবাদের সেই অঙ্কুর সহজ বৃদ্ধির পথে এগোতে পারেনি, উপযুক্ত সাহচর্যের অভাবে। অথচ এই বস্তুটির প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। নিজের চেষ্টায় যারা বড়ো হয় আমি তাদের একজন নই। আমার সামনে পেছনে, আশে পাশে আরও অনেকে চলতে থাকলে সেই মিছিলের টানে একরকম করে চলতে পারি অমি। কিন্তু অজানা পথে একলা এগোবার সামর্থ্য আমার নেই। কলকাতায় এসে "যোগাভ্যাসে" বাধা পড়ল নানা কারণে। প্রথমত, কোনও সঙ্গী পেলাম না। দ্বিতীয়ত, বাড়ির কলহের আবহাওয়া মনকে অস্থির

করে তুলত, হোস্টেলের অন্যান্য আকর্ষণ আমায় টানল। তৃতীয়ত আমারই মধ্যেকার আধো জাগ্রত যৌন চেতনা নতুন অবস্থার অনুকূল আবহাওয়ায় পূর্ণ আয়তনে জেগে উঠতে লাগল। এরই প্রকাশ দেখেছি, চৌরঙ্গির পথে পথে ঘুরে বেড়ানোয়, যৌন আলোচনায়, যৌন রসসিক্ত উপন্যাসের সন্ধানে।

এই পথে চলতে চলতে অম্লানকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য করলাম ছেলেটি কারও সাথে কথা বলে না, মাথা নিচু করে হাঁটে, নিজের মনের মতন পড়াশুনো করে। এর একটি স্বতন্ত্র জীবন ছিল, কোনও সহপাঠীর উপর ও কোনও কিছুর জন্যেই নির্ভর করত না। এই জিনিস আগে চোখে পড়েনি তাই আকৃষ্ট হলাম এই ভালো ছেলেদের চিরদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। কোথাও কোনও ভালো ছেলের কৃতিত্বের কথা শুনলেই বাবা-মার কাছে গল্প করেছি। ওঁরা বলতেন ওইরকম হতে পারো না? কেমন করে জানি জানতুম যে ওরা একধরনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, তারই বলে যা ধরে তাতেই সাফল্য অর্জন করে। এমনি একটা বিশ্বাস থাকার ফলে কোনওদিন ভালোদের সাথে প্রতিযোগিতা করবার চিন্তাও করিনি। ভেবেছি আমি তো বুদ্ধিমান ছেলে নই তাছাড়া ওদের মতন নিয়মিত পড়াশুনোও করিনি, পারব কেন ওদের সঙ্গে? আমি সাধারণ ছেলে, ভালো তো নই সে তো সবাই জানে—এমনি একটা ভাব ছিল। এ যেন আমার গর্ব। আমি স্বীকার করি সে গর্বটা ছোটোবেলা থেকেই ছিল। তবু খারাপ ছেলে হয়েও ভালোদের সাথে মেশা, তাদের কথা শোনা, বুঝতে চেষ্টা করা, তাদের প্রশংসা করা—ইত্যাদি গুণ আয়ত্ত করলাম। "ফার্স্ট বয় ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলি না" এই কথাটা কোথায় যেন শুনেছিলাম। মনে ছাপ পড়েছিল। ভালোদের সঙ্গে মিশে ভালো ছাত্র হওয়া আমার হল না, কিন্তু তাদের হাব ভাব, মনোবৃত্তি, ব্যবহার ইত্যাদি শিখে ফেল্লাম। তাদের সবাইকে বিনয়ী দেখতে আমার ভালো লাগত। গর্ব আমি সহ্য করতে পারতুম না। বিনয়ী ভালো ছাত্ররা ছিল আমার বন্ধু। কিন্তু যত ভালোই হোক 'তোমরা তো ভাই ভালো ছাত্র আমাকে তোমাদের ভালো লাগে এ আমার সৌভাগ্য'—এমনিতর একটা হীন ভাব আমার সকল চিন্তার মূলে থাকত। এই মনোবৃত্তি অম্লানকে দেখে আবার জাগল। বহু দিন ধরে, বহু ধৈর্যের সঙ্গে, অনেক আঘাত সয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছি। প্রথম দিকে ও এক দিন বলেছিল, "তুমি তো সাধারণ ছেলে তোমার মতো কতই তো আছে।" বেশ টের পেলাম আমার মুখটা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল, তবু সে ভাব চাপা দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ তা তো আছেই।" এই কথা আমার আত্মসম্মানকে আঘাত দেয়, আমার প্রতিবাদ করা উচিত, সে কথা বুঝতে চাইনি। বিবেকানন্দের শিক্ষা—অপরের দোষ দেখবার আগে নিজের দোষ বিচার করবে। নিজেকে চির অপরাধী বলে জেনেছি, ভাবলুম ও তো ঠিক বলেছে, আমি তো কত সাধারণ। সেদিনও মনের গভীরে লুকিয়ে ছিল এক গর্ব, —আমি এই আঘাত বুক পেতে নিয়েছি, ও কিন্তু পারত না এমনি করে সইতে। নিজেকে চেপে রেখে এমনি করে বন্ধুর পার্শ্বচর হয়ে রইলাম, স্বেচ্ছায় অনেক কাজ করে দিতাম।

অম্লান আমায় স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাল। সেই সাথে পুরোনো সংস্কারের বেড়া দিল ভেঙে। যৌন আলোচনা দোষের নয়, যৌন ব্যবহারও স্বাভাবিক জিনিষ, এমনি ধরনের চিন্তা আমার

সংযমের বাঁধ দিল আরও আলগা করে। এই সময়ে অম্লানের সাথে গান্ধিজির আদর্শকে ভক্তি করতে শিখলাম। অহিংসার দর্শনকে সমালোচনা করতাম যৌন বিষয়ে গোঁড়ামির জন্যে।

সেকেণ্ড ইয়ার থেকে নানা উপায়ে যৌন পরিতৃপ্তির পথ খুঁজেছি। অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে সেই তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়াস চলে এসেছে। আজও সেটা চলছে। হয়তো কিছুদিন পরেই একে সোজাসুজি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আজও এর গতি অপ্রতিহত। অন্যান্য কাজের তাগিদ বাড়াতে চেষ্টা করছি কিন্তু বুঝতে পারছি সেটাই যথেষ্ট নয়।

যৌন ইচ্ছার রাশ টেনে ধরবার ক্ষমতা সেদিন যা ছিল আজও বোধহয় তাই আছে কিন্তু আমার চিন্তার ক্ষমতা, কথায় চিন্তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা বেড়েছে। আজ আমি নিজে নিজে ভাবতে পারি, সামান্য কিছু লিখতেও পারি। বুদ্ধিমানদের সাথে মিশে খানিকটা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটেছে, সুন্দর বন্ধুদের পেয়ে মনের সম্পদও কিছু জমেছে এখন শক্তিমানদের সাহচর্য থেকে খানিকটা শক্তি আহরণ করা আমার একান্ত দরকার। তাই তো রঞ্জিতদা, সন্তোষ, শক্রজিৎ এদের প্রয়োজন আমার জীবনে দেখা দিল। হরিদাসও আঘাতে আঘাতে আমাকে অনেক শক্ত করেছে আর সাংসারিক বুদ্ধিও কিছু শিখিয়েছে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার মেলে না, আজও ওর সঙ্গে কী যে আমার সম্পর্ক জানি না।

কলকাতা

১৮ মে

ছোটোদের সাথে আজও আমি মানুষের মতন ব্যবহার করতে শিখলুম না। মা, বাবা, দাদাদের দেখাদেখি শাসন করবার কায়দাকানুন শিখেছি। ছোটোরা অবাধ্য হলে তাকে গায়ের জোরে বাধ্য করা, জেদি হলে ততোধিক জেদ প্রয়োগ করে জেদ ভাঙা, খুঁটিনাটি সকল কাজে ত্রুটি ধরা ইত্যাদি থেকে শুরু করে কত রকমের দুর্ব্যবহার যে করেছি ও আজও করছি তার ঠিক নেই। বই-এ পড়েছি ওদের দেহের মতন ওদের মনও বেশ কোমল হয়, খুব সাবধানে, অনেক ধৈর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় ওদের সঙ্গে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বই-এ পড়েছি চারাগাছের মতন শিশুরা বাড়ে, কঠিন আঘাত এদের সহ্য হয় না। শিক্ষকের কর্তব্য শুধু এর চারপাশে অনুকূল একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যাতে সে বাড়তে পারে। অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আমি জানি না, আমার মা বাবা বোধহয় আরও কম জানেন। কিন্তু অনুকূল আবহাওয়া না পেলেও এরা বাড়ে এবং বিকৃত হয়ে বাড়ে। ছোটোবেলাকার গঠন হয়ে যখন গোড়া পাকা হয়ে যায় তখন আর তার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় না। তাই শিশুকাল থেকে আট-নয় বছর পর্যন্ত খুব যত্নের সঙ্গে এদের বড়ো করতে হয়। এমনি অনেক কথা শুনেছি, পড়েছি কিন্তু বিদ্যা যে কত অসম্পূর্ণ বুঝি নিজের ব্যবহার দেখে। পশুর মতন ব্যবহার করি আমি।

ছেটোবেলায় যে জিনিসটি এদের একান্ত দরকার সে হল ভালোবাসা। ভালোবাসার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এদের মনের সবুজ পাতা বাইরে ফুটতে শুরু করে। ভালোবাসার নিশ্চিন্ত আশ্রয়টুকু পেলে ধীরে ধীরে ওরা বেড়ে ওঠে অতি সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে করতে।

আরেকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কিছু কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকে। হাতের কাছে সৃষ্টির উপকরণ যুগিয়ে দেওয়া ও নানান ধরনের শিল্পবস্তু দেখিয়ে

সৌন্দর্য্যবোধকে জাগিয়ে তোলা খুব দরকার। শিশু যেন বিনা কাজে অলস ভাবে সময় না কাটায় সেটাও দেখা দরকার।

শিষ্টাচার শেখানো দরকার মানি কিন্তু এই শিক্ষাকে আমি বড়ো বলে মনে করি না। ছোটোদের সৌন্দর্যবোধ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোনরকম ব্যবহার সুন্দর ও শোভন সেটাও শেখানো যায়। বাধ্য করে কাজ না করিয়ে ওদের মনে প্রেরণা জুগিয়ে কাজ করানো অনেক ভালো।

কিন্তু এর কোনওটিই আমি করতে পারি না। বাড়ির এমনই আবহাওয়া যে শিষ্টাচার শেখানোই সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। ভালোবাসার বদলে এরা পায় রূঢ় আচরণ। সাহচর্যের ও সহানুভূতির বদলে জোটে শাসন ও তিরস্কার। অবজ্ঞাও জোটে মাঝে মাঝে। এ বাড়ির কেউই ছোটোখাটো ত্রুটি ক্ষমা করতে জানেন না ফলে আমাকে নিছক পুলিশের কর্তব্য করতেও হয়েছে। এদের সৃষ্টিক্ষমতা বাড়াতে কিছু চেষ্টা করেছিলাম লিখতে দিয়ে। কিন্তু বাড়ির উদাসীনতায় সে চেষ্টাও বাধা পেয়েছে।

কিন্তু সে যাই হোক আমার ব্যবহারের মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি রয়ে গেছে। সব সময়ে নজর রাখতে পারি না এই কাজের উপর। মিথ্যা অভিমান করে দূরে সরে যাই বার বার, শাস্তি দেবার ভয়ও দেখাই কিন্তু এতে ওদের মনে কোনও ভালো প্রভাব ছড়ায় না। ভানু মিঠুকে গড়বার কাজে হাত লাগাতে হলে মার সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারা যাবে না। মা আর আমি এ প্রসঙ্গে পরামর্শ করে যদি কোনও পরিকল্পনা করতে পারি তবেই সেটা কাজে ফলানো যেতে পারে। কিন্তু মার সঙ্গে আমার আলোচনার সম্পর্ক নয়, অদূর ভবিষ্যতে যে গড়ে উঠবে তারও কোনও আশা নেই। তাই আমার ব্যবহার দিয়ে ওদের যত সুন্দর করতে পারি সেই চেষ্টাই করব। যখনই আমার সাথে যোগাযোগ ঘটবে তখনই ওরা আনন্দ পাবে এটুকু যদি করতে পারি তবেই আমি খুশি হব।

২২ মে।

অনেক কথা ভিড় করে আসছে মনে। দুপুরে বসে বসে ডায়েরিতে লিখবার অনেক বিষয় মনে পড়ল। অম্লানের কথা, ভানুমিঠুর কথা, বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা, বঙ্কিম রচনা এমনি আরও কত কী। আমার লেখার অভ্যেস একটুও বাড়েনি, লেখার ধরন একটুও উন্নত হয়নি, খারাপ লাগে তবু লিখে চলি, না লিখলে আরও খারাপ লাগবে।

পড়াশুনোর ব্যাপারে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। ভয় লাগে, হয়তো খারাপ হবে পরীক্ষার ফল, হয়তো আবার মাথা নিচু হয়ে যাবে হরিদাসের কাছে। ইংরাজি লেখবার অভ্যাসটাও বিশেষ হল না। এই সব দেখে শুনে মনে হয় M.A পরীক্ষাতে ভালো হবে না। আর তাই যদি না হয় ভবিষ্যৎও ভালো কাটবে না। স্বাধীন হবার স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হবে। সেই দিনগুলির কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

বাইরের বই, পত্রিকা ইত্যাদি পড়া আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পড়ার বই পড়তে গেলেই মনে হয় এ তো আছেই আগে একটু অমুক বইটা পড়ে নিই। তাই করতে গিয়ে কোনওদিনই সামলাতে পারি না। তাছাড়া ইতিহাসের ওই মোটা মোটা বইগুলির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আর আমি পারি না। এই না পারার অস্থিরতা আমার মনের তলায় কাজ করে চলে। অম্লানের সঙ্গে

প্রাণ খুলে আলোচনা করতে পারি না। ওকে যখন খুব নিবিড় করেও পাই তখনও যেন সজাগ থাকি—আমার কাজ করা হয়নি। আমার মনের ভিতরকার এই অস্বাস্থ্যকর দ্বন্দ্ব আমার শক্তিক্ষয় করে চলেছে। ব্যায়াম করে সুপুষ্টি খাদ্য খেয়েও সেই শক্তি আহরণ করতে পারছি না। শরীর চর্চার মতন জোর করে খানিকটা করেই পাঠচর্চা করতে পারলে বোধহয় উপকার হত। ...

এদিকে বাড়ির অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। দেরি করে উঠি। পঙ্কুকে (*পঙ্কু ওই পরিবারের ২৪ সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বহু বছরের পাচিকা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, ১৯৬২-তে প্রবালও দেখেছে, এটুকুই বলা সম্ভব, এর চেয়ে বেশি যাঁরা জানতেন তাঁরা নেই।*) খাবার দিতে বলি পড়ার ঘরে, দুপুরেও ঘুমোতে শুরু করেছি, রাত্রে ফিরে খেয়ে বারান্দায় বসে ঘুমোবার উপায় খুঁজি। মার হাঁটুতে মাথা রেখে কানে ওষুধ দিচ্ছি, নাকে সেঁক দেবার জন্যে মার হাতের সেবা নিচ্ছি মোটামুটি কম কথা বলে। ওদিকে বাবার কাছে রাজনীতির দুটো চারটে বুলি ছাড়তে মন খুসখুস করে ওঠে। মাঝে মাঝে তাও করি। আমার ইচ্ছা ছিল বাড়ি থেকে সরে আসা, ক্রমে জড়িয়ে পড়ছি। খুব যে ভালো লাগছে তা মোটেই নয় কিন্তু এখানে থাকলে আর পড়াশুনো না করলে বোধহয় এমনিই হবে।

বাড়িতে এলেই ভানু মিঠুর সাথে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই জিনিসটি আমার মনের অনেকটা অধিকার করে রাখে। বোধহয় কর্তৃত্ব করবার তৃষ্ণা এ পথেই পরিতৃপ্ত হয়। এক সময় ছিল যখন কথার অবাধ্য হলে বলপ্রয়োগ করে শাসন করেছি। আজ আর সেদিন নেই কিন্তু সে স্তর ছেড়ে খুব উঁচুতে উঠেছি তাও নয়। ওদের ব্যবহার যখন পারিবারিক শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করে তখন ওদের শাসনের সুরে শুধরে দেওয়া আমার স্বভাব। কোথায় বড়োদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল কোথায় পাকা পাকা কথা বলল, কোথায় বড়োদের কাছে গিয়ে কথা শুনল এই সবের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্য যেকোনও কাজের মধ্যেও এইগুলি আমার দৃষ্টি বা শ্রুতি এড়িয়ে চলে না। বেশ বেসামাল হয়ে পড়ি মনে মনে। মনে হয় যাই ধরে নিয়ে আসি অথবা থামিয়ে দিয়ে আসি। কোনও সময় মনে হয় ওদের কোনও সৃষ্টিমূলক কাজে নিযুক্ত রাখা হচ্ছে না। শেষে আমার মতন ঢিলেঢালা মন হবে একটুও মন লাগাতে পারবে না কোনও কাজে। গল্পের বই পড়তে দিই ছবি দেখতে ও আঁকতে দিই কিন্তু যখনই অবহেলা দেখি তখনই ভয়ানক খারাপ লাগে। ভাবি এরা কী হবে ভবিষ্যতে। অভিমান করে কথা বলি না, বইপত্র সরিয়ে নিই, কিন্তু কোনও দাগই কাটতে পারি না ওদের মনে। ওরা থাকে আপন আপন খেয়ালে তন্ময় হয়ে, আমায় দেখলে হয়তো একটু ভয় পায় তারপর সব ভুলে যায়। এরই মধ্যে বিকৃতি ধরেছে কিন্তু ওদের অপরাধী মনে করব কী করে? বাড়ির একটি লোকও জানে না কী করে ওদের সাথে ব্যবহার করতে হয়। এই আবহাওয়ায় যতদিন মানুষ হবে ততদিন কেমন করে ওদের আড়াল করে রাখব? মার প্রভাব এদের উপর খুব বেশি। সেই মাই বেশ অধৈর্য। মাঝে মাঝে বেশ সংযত ব্যবহার করেন কিন্তু এদের শ্রদ্ধা করেন না এতটুকুও। ওরা কিছু হয়নি, কোনও ক্ষমতা ওদের নেই, মাথাভর্তি গোবর এই ধরনের মন্তব্য করেই চলেছেন একটুও বাধে না। মনে হবে এই কুশিক্ষার বোঝা আমাকেই বইতে হবে তাই এখনই হস্তক্ষেপ করি। আবার মনে হয় দরকার কী আমার। আমার কথা ওরা বুঝবে না। তাছাড়া যখন ছেড়েই যাব তখন অত দরদ কিসের? এমনি করে আবার জড়িয়ে যাব ওরা আরও বেশি নির্ভর করবে আমার উপর। ওদের

একেবারে সীমানার বাইরে রেখে দিতেও পারি না অথচ ওদের ভার নিতেও পারি না এই এক বিচিত্র অবস্থায় রয়েছি। ...

অম্লানের সাথে কথাবার্তায় আমার বুদ্ধির প্রসঙ্গ উঠেছে প্রায়ই। ওর মতে আমি নাকি বেশ বুদ্ধিমান। বেশ লাগল কথাটা শুনে। আমার কাছে অম্লানের বুদ্ধি আর সকলের বুদ্ধি মাপবার মাপকাঠি। অম্লানের বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করি আমি। সেই অম্লান যখন আমাকে বুদ্ধিমান বলে গর্বিত হবার কারণ আছে বৈ কি আমার। কিন্তু আমার হীনমন্যতা কালো মেঘের মতন মনকে ঘিরে রয়েছে, তার সীমারেখায় খুশির বা চলকে ওঠা গর্বের বিদ্যুৎরেখা দেখা গেলেও মেঘের ম্লানিমা অবিচলিত থাকে। আমার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন আমি। তবু অম্লানের এই সমর্থন আমার কাজেই আসবে। হয়তো কিছুটা আত্মবিশ্বাসী করবে ওর এই উক্তি।

বেশ টের পাই অম্লান দূরে সরে যাচ্ছে। তাই এই সম্পর্কের কথা আবার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। আর বোধহয় ও কিছু পায় না। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়, হয়তো বা ও বিলেত চলল। বিলেত যেতে পারলে ওর ভালোই হবে আর ও খুশিই হবে। আমি ওর বন্ধু হয়েও তবু কেন ওর না যাওয়া কামনা করব? করি দুটি কারণে। আমার বুদ্ধিজগতে ও আমার খুব বড়ো সম্পদ। দ্বিতীয়ত আজকের দুর্যোগ ভরা দিনে ওর সামাজিক সমর্থনও আমার একান্ত প্রয়োজন। আমরা দুজনে ওকে ছাড়া আর কাউকে তো কাছে পাব না। কিন্তু ওকে যদি আমরা পূর্ণ করে তুলতে না পারি, ওর তৃষ্ণা যদি মেটাতে না পারি তবে কীসের জোরে ওকে বাঁধব? ওকে ছাড়া বেশ একলা মনে হবে, কিন্তু এটা নিতান্তই সাংসারিক দুশ্চিন্তা। আমার সাংসারিক স্বার্থকে ওর জীবনে প্রতিবন্ধক হতে দেব না, তার ফল সে যেখানে গিয়েই দাঁড়াক।

২৪ মে

অশান্ত হয়ে উঠেছে আমার মন। সকাল থেকে পড়াশুনো কিছু হয়নি। দুপুরে মিহিরের সঙ্গে দেখা হল। একথা সেকথা হল। বারবারই মনে উঁকি দিচ্ছিল সেই চিন্তা—ভালো কথা বলছি তো? মিহির[১৬] একজন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, ওর মনে আমার সম্বন্ধে ভালো ধারণা হচ্ছে তো? লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথে ইউনিভার্সিটিতে এলাম। মনে হতে লাগল কবে আমার নিজের আত্মাকে খুঁজে পাব, কবে আমি সত্যি করে আমি হয়ে উঠব? এমনি করে ভালো ধারণা ভিক্ষা করে আর কতদিন গ্লানি বয়ে বেড়াব? অম্লান, হরিদাস, রঞ্জিত, অশোক এরা ভালোছেলে, ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। আমি এদের সাথে কথা বলি কিন্তু আমার কোনও ক্ষমতা নেই, জীবনের ইতিহাসে উজ্জ্বল কোনও অধ্যায় নেই। কেন মিশতে যাই ওদের সঙ্গে, আর এমনি করে মনের মধ্যে ভালোত্ব প্রচার করবার হীন কামনা নিয়ে? আত্মগ্লানিতে মনটা কেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, এমনি সময় হরিদাসের সঙ্গে দেখা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে। খানিক বাজে গল্প বলবার পর ও জানাল যে আমাকে ও ফোন করে ডেকে এনেছে একটা বিশেষ কাজের জন্যে। কী সেই কাজ? উমার ভাই এসেছে কলকাতায়, শিবপুরে পড়বে, তাকে ও ডেকে এনে সাহায্য করতে চায়। তাই পত্রবাহক হয়ে আমাকে যেতে হবে উমার দিদির বাড়িতে। ভালো লাগল না শুনে। এই বাড়িতে এই কাজে আগে কয়েকবার যেতে হয়েছে আমাকে। কোনওবারই আনন্দের সঙ্গে যাইনি। কিন্তু এবার যেন আরও খারাপ লাগল। ওকে

বললাম এ তো তুমিও করতে পারতে। ওকে ও বাড়ির সবাই চেনে ওর যাওয়া চলতে পারে না ইত্যাদি যুক্তি দেখাল। সন্তুষ্ট হলাম না। অসন্তোষ আরও বাড়ল যখন ও বলল তোমাকে আজ আমার খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। এমনিই ও করে। কোনও কাজ করাবার আগে ও খাওয়াবার প্রস্তাব তোলে, খাওয়া হয় তারপর কাজটাও হয়। এই ওর অভিজ্ঞতা; এইভাবে খাওয়ালে আমি যে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হই না, বরঞ্চ বিরক্ত হই, সে কথা ও আজও জানে না। ও জানে এটুকু করলে মুখে যাই বলি না কেন ন্যায়ত আমার আর কিছু নালিশ করার থাকবে না, এই শিশুসুলভ চিন্তা অনুসরণ করে ও চিরকাল আমার ক্ষেত্রে এই ব্যবহার করে আসছে, আজকেও করল। আমিও চিরদিন ওর সাথে খেয়েছি, ওর কাজও করে দিয়েছি। তাই যখন বলেছি বা বোঝাতে চেয়েছি যে খেতে আমার ভালো লাগে না আর বিশেষ করে এই ধরনের খাওয়া তখন ও বিশ্বাস করে না। নিজের বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের উপর ওর বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুপুর কেটে গেল। গোলদিঘির পাড়ে একটা বেঞ্চিতে বসে দুই বন্ধুতে কথা বলে গেলাম। মানুষ সম্বন্ধে ওর দৃষ্টিভঙ্গি আমার সাথে মেলে না এই নিয়েই কথা চলছিল। নারায়ণ, অমল, অশোক, তপন, আমি—এদের প্রতি ওর মনোভাব নিয়ে কথা চলছিল। এই ধরনের কথাবার্তায় আমি খুশি হতে পারি না কোনও দিন। কোনওদিন অমলকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়, কোনওদিন আবার বন্ধুর আসনে স্থান দেয়। অশোকের সাথে ওর সাম্প্রতিক কলহ, নারায়ণের ভীরুতা—ইত্যাদি বিষয়েও বলে চলল। মানুষকে ও তত ভালো মনে করে না যতটা আমরা করি। মানুষের মধ্যেকার নীচতা, কদর্যতা দেখেও তার উজ্জ্বল, সুন্দর দিকগুলিকে ও ভালো বলতে পারে। যারা নিজেদের সাধু বলে পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে কত নীচতা, শঠতা থাকে। যারা বাইরে দুর্ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে কত মহত্ত্ব থাকে। জীবন-দর্শন একরকম হতে পারে কিন্তু ব্যবহারটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সম্ভব এবং তাই হলে নিন্দনীয় কিছু নেই, কারণ জীবনটাই ওইরকম। সুরুচিসম্পন্ন বলে যারা নিজেদের জাহির করে তারা এর আড়ালে কেমন করে নিজেদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা ঢেকে রাখে। এমনি আরও অনেক কথা। কিছু শুনলাম কিছু প্রতিবাদ করলাম কিন্তু একটুও ভালো লাগল না শুনে। মানুষ খুব জটিল জীব হতে পারে, তার মধ্যে অনেক কদর্যতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই সব মানুষই যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরল, আর যেন কোথাও কিছু নেই। হাঁপিয়ে উঠলাম, অস্থির লাগতে লাগল। বুঝতে পারলুম হরিদাসের জগৎ আমার জগৎ স্বতন্ত্র। ওর নীতিনিয়মের অনেক কিছুই আমার জগতে অচল। কোথায় যেন ভালোবাসার একটা অভাব অনুভব করলাম। মানুষকে ভালোবাসা কঠিন এ কথা জানি কিন্তু সেই কঠিন কাজটাও যে চেষ্টা করে করা দরকার সে কথা শুনলাম না ওর মুখে। সব সময়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছি, শত্রুরই অস্ত্রশালা থেকে অস্ত্র এনে ব্যবহার করছি, আবার মাঝে মাঝে ভালোও বাসছি : মানুষের সঙ্গে এইরকম আচরণ সারা জীবন ধরে করবার কথা কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে না।

আমাকে লক্ষ্য করে কথার ফাঁকে ফাঁকে অনেক মুষল ও নিক্ষেপ করেছে; আঘাত যে একেবারে লাগেনি তাও নয়, জেদ করে ঝগড়াটা চালিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে সবকে ছাপিয়ে উঠছিল একটা অস্বস্তির ভাব—এ মানুষ আমার আপনার লোক নয়। এর জগতে আমার কোনও স্থান নেই। যে স্থান আছে সেটুকু না থাকলেই ছিল ভালো।

হরিদাসের নিজের উপর অগাধ শ্রদ্ধা, ওর নিজের বিশ্লেষণের ভুল স্বীকার করতে শুনিনি কোনওদিন। কারও প্রতি কোনও ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করতেও বড়ো একটা শুনিনি। এই জিনিসটি আমার ভালো লাগে না। একে ঠিক আত্মশ্রদ্ধা বলে না একে বলে আত্ম-মমতা, যে মমতা বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে, আচ্ছন্ন করে, অন্যের সম্বন্ধে রূঢ় কথা বলতে ওর দ্বিধা হয় না, তাকে ও বলিষ্ঠ জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে জানে। রূঢ়তা শুধু নয় অসুন্দর ও কুশ্রী শব্দ ব্যবহার করতেও ওর বাধে না। ওর এই বিকৃত রুচিবোধও আমাকে কষ্ট দেয়। মানুষকে আঘাত দিতে হলেই যে যথাসম্ভব কুৎসিত ভাবে দিতে হবে এমন কোনও কথা নেই। হরিদাস স্বেচ্ছায় কুৎসিত হয় তা বোধহয় নয় কিন্তু ওর এই সকল ব্যবহার বেশ রুচিবোধের অভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে।

ওকে আমার অনেক সময়েই ভালো লাগে না। সেটা কিসের প্রকাশ জানি না। ভবিষ্যতে বিশ্লেষণী যন্ত্রের সন্ধানী আলো ফেলে দেখা যাবে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার একটা বন্ধনও আছে সেটাও সত্য। কিসের আকর্ষণে যেন ও আমাকে টানে। এই আকর্ষণের মাঝে স্বার্থসেবারও ইঙ্গিত রয়েছে, এটিও বিচারসাপেক্ষ।

সন্ধ্যায় অম্লান, রঞ্জিতদা এদের সাথে আলাপ হল। অম্লানের লঘুচিত্ততা আমাকে আরও অস্থির করে তুলল। রঞ্জিতদার কথারও কোনও বাঁধবার শক্তি ছিল না। ভিতরকার অসন্তোষ সারা মনে ছড়িয়ে পড়ল। বাইরের বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। ওরা বাধা দিল। মনে হতে লাগল ওদের ছেড়ে আজ পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই আমার দরকার, আজ যে নিজেকে খুঁজে পাবার ব্যাকুলতা এসেছে, এর চেয়ে বড়ো আহ্বান আর যে কিছু নেই। মনে হল মানুষকে আমি ভালোবাসতে পারব। হরিদাসের নির্দয় আঘাত সহ্য করেও, আরও অনেক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে গিয়েও আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। আমার বন্ধুটির ভালোবাসা আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদভাণ্ডার হয়ে রইবে। এই প্রস্রবণের ধারা বারে বারে আমায় নির্মল করে, সঞ্জীবিত করে তুলবে। নিন্দা, অপমান সইতে আমার কষ্ট হবে না কিন্তু উগ্র আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করতে আমার সাধনা করতে হবে ও আমি পারব না। তার চেয়ে ছোটো হয়ে আঘাত আমি সইব, আমার ভালোবাসা আমায় বড়ো করবে, সুন্দর করবে।

রঞ্জিতদা হয়তো ফ্রান্সে চললেন, অম্লান হয়তো যাবে ইংলণ্ডে, হরিদাসের উপরও আর নির্ভর করা যাবে না। নিজের একাকীত্ব বেশ অনুভব করলুম আজ সন্ধ্যায়। ভয় পাই, অজানা ভয় কিন্তু কোথায় যেন সাহস লুকিয়ে আছে মনে। বিপদের দিনে বোধ হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে পারব। আমার স্বতন্ত্র পথে যাত্রা আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবার দিন এল। আজ আমি একা নই, আমার সুন্দর বন্ধু আমার সহযাত্রী। এরা সবাই হয়তো ছেড়ে যাবে আমায় কিন্তু বন্ধুর জগতে আমি অমূল্য, তার কল্যাণস্পর্শ আমায় ঘিরে রইবে অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতির বলয়ের মতন।

(ডায়েরির খাতা শেষ)

(ডায়েরিতে গুঁজে রাখা চিরকুটে হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা বার্তা)

অরুণ,

তোমার কাছে আমার Hayes-এর History-টা বোধহয় আছে। থাকলে, বাড়িতে রেখে

যেয়ো। পরের দিন নিয়ে যাবো। তোমাকে অনেকগুলি খবরও দেবার ছিল। কিন্তু দেখা হবার মতো সম্ভাবনা কমই। পরে পত্রে সব জানাবো।

হরিদাস

টীকা

১. 'বইএর' : এই ধরনের অল্প দুয়েকটা বানান অসংশোধিত রেখে দিলাম যাতে ডায়েরি-লেখকের নিজস্ব রুচি সবটা হারিয়ে না যায়; বিশেষত 'ইংরেজ/ইংরেজি, ইংরাজ/ইংরাজি'র বেলায় কিছু অস্থিরতা আছে, সেই অস্থিরতায় হাত দিইনি, তবে মোটের উপর আধুনিক বানান অনুযায়ী সম্পাদনা করেছি যাতে ওই যুগের অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে চোখ আটকে না যায়—'ঐ, মুহূর্ত্ত, কর্ম্ম', ইত্যাদি পাল্টে 'ওই, মুহূর্ত, কর্ম' করে দিয়েছি, এমনকি 'ইংরেজি/ইংরাজি'র রে/রা-ঘটিত অস্থিরতায় হাত না দিলেও মূলে যে জ-য়ে দীর্ঘ ঈ ছিল সেটাকে পাল্টে আধুনিক বানান অনুযায়ী হ্রস্ব ই বসিয়েছি। কয়েক জায়গায় লেখক ইংরিজিতে লিখেছেন, অভ্যেস করবেন বলেই; তাঁর ইংরিজির একটা ভুলও সংশোধন করিনি, এবং ওই ভাষায় তিনি যা ভুলচুক করেছেন তার দিকে 'তথৈব' বলে বিশেষ করে নজরও টানিনি; একুশ বছর বয়সে কতদূর এগোতে পেরেছিলেন বা পারেননি তার যথাযথ ছবি দেখতে পাওয়া জরুরি।

২. এই বাক্যের মতো যেখানে যেখানে তিনটে ফুটকি রয়েছে ..., সেই সেই জায়গায় ফুটকি ডায়েরিতেই ছিল। সম্পাদকের বাদ দেওয়া রচনাংশে ফুটকির আগে-পরে বন্ধনী বসিয়েছি, অর্থাৎ [....] - ১২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. পরিবারের কথা কিংবা প্রেমাস্পদের কথা ডায়েরিতে যা বলা আছে তার বেশি খবর দেওয়া এই টীকাগুলির উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র সহপাঠীদের আর একটু ছোটো-বড়ো সমকালীনদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে যাতে পাঠক সুপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে অন্যান্য উৎস থেকে যা জেনেছেন সেই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। তবে বয়ানের অনুধাবনের স্বার্থেই এই জায়গায় জানানো দরকার যে অরুণ যাঁকে বিয়ে করবেন বলে তখন ভাবছেন, তিন বছর বাদে যাঁকে বিয়ে করলেনও, তিনি সম্পর্কে অরুণের 'সেকেণ্ড কাজিন' হতেন। পাত্রের পিতামহ আর পাত্রীর মাতামহ ছিলেন পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা। তবে পাত্র পাত্রীর যখন প্রথম পরিচয় ঘটে তখন তাঁদের বয়স ছিল যথাক্রমে উনিশ আর ষোলো, এর আগে তাঁরা পরস্পরকে চিনতেন না, পাত্রের বাবার পরিবারের সঙ্গে পাত্রীর মায়ের পরিবারের নিয়মিত কোনও যোগাযোগ ছিল না। এ বিয়েতে দু পক্ষেরই পরিবারের অসম্মতি সুস্পষ্ট ছিল (তবে সে বিরোধিতা অপ্রীতির প্রকাশেই সীমাবদ্ধ ছিল, কোনও আগ্রাসন ঘটেনি)। বিবাহপর্বের সামাল দেওয়া থেকে শুরু করে মাথা গোঁজার জায়গা জুটিয়ে দেওয়া, প্রায় সবটাই বন্ধুবৃত্তের কৃতিত্ব (পরিবারের তরফ থেকে ন্যূনতম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি তা নয়, পাত্রীর বাবা নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন) : সেই বন্ধুবৃত্তের গোড়াপত্তনের কাহিনি রয়েছে এই ডায়েরিতে।

৪. অশোক সেন (১১.১২.১৯২৭-১০.১২.২০১৫), বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র; মহলানবিশের ডাকে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ার ভিত্তিস্থানীয় কিছু বিশ্লেষণী দলিল লিখেছিলেন। ষাটের দশকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার পর ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বরুণ দে-র পরিচালিত সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, এবং ১৯৭৮ থেকে প্রভাবশালী *বারোমাস* পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায়, সাংস্কৃতিক ও সারস্বত নেতৃত্ব দেন।

৫. তপন রায়চৌধুরী (৮.৫.১৯২৬ - ২৬.১১.২০১৪), বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ, স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার পর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশ দিয়ে যদুনাথ সরকারের কাছে প্রথম ডি ফিল অর্জন করে নিয়ে, অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে সি সি ডেভিস-এর কাছে দ্বিতীয় ডি ফিল করেন। দেশে ফিরে জাতীয় মহাফেজখানার সহপরিচালকের দায়িত্ব, তারপর দিল্লি স্কুল অভ ইকনমিক্সে অধ্যাপনা (১৯৫৯-৭০) ও পরিচালনা (১৯৬৫-৬৭), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা (১৯৭০-৭২), অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা (১৯৭৩-৯২)। ইতিহাসের গবেষণার বাইরে পাঠকের মন জয় করেন প্রধানত *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা* (১৯৯৩) ও *বাঙালনামা* (২০০৭)-এর মতো সরস গ্রন্থ রচনা করে।

৬. অম্লান দত্ত (১৭.৬.১৯২৪-১৮.২.২০১০), বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ; প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, ১৯৪১ সাল থেকে হস্টেলে অরুণের প্রতিবেশী, শিগগিরই হয়ে ওঠেন নিত্যসঙ্গী; ১৯৪৬ থেকে আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা, ১৯৪৮ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা (সেখানে সহযোগী উপাচার্যের দায়িত্ব ১৯৭২-৭৪); উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ১৯৭৪-৭৭; গান্ধিয়ান ইনস্টিটিউট অভ স্টাডিজের পরিচালনা ১৯৭৮-৮০; বিশ্বভারতীর উপাচার্য ১৯৮০-৮৪। সক্রিয় গান্ধিবাদী হিসেবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। জনপরিসরে সক্রিয় গণতন্ত্র-ব্রতী বুদ্ধিজীবী রূপে যৌবন থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ২০০৬-এর ডিসেম্বরে সিঙ্গুর আন্দোলনের সূত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশনে এক দিন প্রতীকী অংশগ্রহণ করেন এবং ওই আন্দোলনের সমর্থনে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন।

৭. হরিদাস মুখোপাধ্যায় (২০.১.১৯২০-১৭.৪.২০১৮), বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, অধ্যাপনা করেছেন প্রধানত প্রেসিডেন্সি কলেজে। স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী উমা মুখোপাধ্যায়ের যৌথ রচনার মধ্যে এই গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য : *'Bande Mataram' and Indian Nationalism, 1906-1908* (১৯৫৭); *The Growth of Nationalism in India, 1857-1905* (১৯৫৭); *The Origins of the National Education Movement, 1905-1910* (১৯৫৭, এ বইয়ের জন্যে তাঁরা রবীন্দ্র পুরস্কার পান ১৯৫৯ সালে), *India's Fight for Freedom; or, the*

Swadeshi Movement 1905-1906 (১৯৫৮)। তাঁর একক রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য *বিনয় সরকারের বৈঠকে* (১ম খণ্ড ১৯৪২, ২য় খণ্ড ১৯৪৩), *বিপ্লবের পথে বাঙ্গালী নারী* (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) আর *The Emancipation of Historical Research* (১৯৫৯)।

৮. রণজিৎ গুহ'র জন্ম ২৩ মে, ১৯২২। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ। মিত্র ইন্সটিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে যোগদান। সাংগঠনিক কাজকর্মে নানা দেশে ভ্রমণ। বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা। ১৯৫৯ সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। তাঁর রচিত *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* গ্রন্থটি সামগ্রিক ইতিহাসচর্চার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া তাঁর বহুচর্চিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত, A Rule of Property of Bengal : An Essay on the Idea of Permanent Settlement; An Indian Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its implications; Dominance without Hegemony : History and Power in Colonial India; The Small Voice of History* ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত *A Subaltern Studies Reader, 1986-1995* প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। সম্প্রতি বাংলাভাষায় তাঁর রচিত একাধিক বই বেরিয়েছে : *কবির নাম ও সর্বনাম, দয়া:রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, প্রেম না পরিণতি* ইত্যাদি। বর্তমানে ভিয়েনায় বসবাস করেন।

৯. অরুণ এম.এ. পরীক্ষা ১৯৪৬ সালে না দিয়ে ১৯৪৭ সালে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওঁর মৃত্যুর পর আমার হাতে এল ওঁর বি.এ. ডিগ্রির দলিল, সবিস্ময়ে দেখলাম যে দলিলে সই করেছিলেন স্বয়ং রাধাবিনোদ পাল। ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে তিনিই ছিলেন উপাচার্য।

১০. ১৬ কেটে ১৭ ফেব্রুয়ারি লেখা হয়েছে কিনা সেটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

১১. এখানে উল্লেখ্য, অরুণ তাঁর পিতার প্রথম পক্ষের সন্তান; মা যখন মারা যান তখন অরুণের বয়স দুই। পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করেন দশ বছর বাদে; আলিপুরে সেই দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ির উল্লেখ করা হচ্ছে ডায়েরিতে। এর চেয়ে বেশি অনুপুঙ্খ এই ডায়েরির অনুধাবনের পক্ষে জরুরি নয়।

১২. এইরকম "[...]" মানে সম্পাদনায় বাদ দেওয়া জায়গা। যেখানে বন্ধনীবিহীন ফুটকি, সে ফুটকি মূল ডায়েরিতেই আছে।

১৩. 'স্বাধীনতা' ছিল কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিকপত্রের নাম।

১৪. 'অমলেন্দু'-র উল্লেখ থেকে বোঝা শক্ত ইংরিজির অমলেন্দুর কথা হচ্ছে, না ইতিহাসের। বয়সের কষ্ঠিপাথরেও আলাদা করা যাবে না। প্রেসিডেন্সিতে অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯২৪-২০০৮) ওই সময়ে ইংরিজির ছাত্র ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে ইন্টারন্যাশনাল

অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির সদর দপ্তরে, ভিয়েনায়, কিছুদিন কাজ করার পর দেশে ফিরে আকাশবাণীতে চাকরি করেন। তারপর স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদকীয় পর্যায়ে কয়েক বছর কাজ করবার পর সম্পাদকের ভূমিকায় ছিলেন ১৯৮০ থেকে ৮৬ সাল পর্যন্ত। একই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন অমলেন্দু গুহ (৩০.১.১৯২৪-৭.৫.২০১৫), বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ তথা কবি। জন্ম মণিপুরের ইম্ফলে, কিন্তু আসামেই বড়ো হয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর প্রথম অধ্যাপনা (তেজপুরের ডারাং কলেজে)। তাঁর রচিত *Planter Raj to Swaraj : Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826-1947* প্রথম বেরোয় ১৯৭৭ সালে; ২০১৪য় দ্বিতীয় সংস্করণ। কর্মজীবনের খানিকটা কাটিয়েছিলেন ভারতের অন্যত্র, পুণের গোখলে ইনস্টিটিউট অভ পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকোনমিক্সে এবং দিল্লি স্কুল অভ ইকোনমিক্সে। অরুণ দুজনকেই চিনতেন জানি, কাকে কবে থেকে চিনতেন জানি না; চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি; ডায়েরিতে যিনি উল্লিখিত তিনি অমলেন্দু গুহ বলেই আন্দাজ করছি।

১৫. সন্তোষ ভট্টাচার্য (১.১১.১৯২৪-১০.৩.২০১১) স্কটিশ চার্চ কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথনীতি পড়েন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপনায় কর্মজীবন কেটেছে; অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় ছিলেন; তাঁর কমিউনিস্ট মতাদর্শ সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকারের নীতির সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধবার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে (১৯৮৩-৮৭) তাঁর দায়িত্বপালন ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে তিনি পরে Red Hammer over Calcutta University 1984-87 নামে যে বই লেখেন সেটি বেরোয় ২০০৯ সালে।

১৬. মিহির বসু (১৯২২-২০০৯) প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরিজি পড়েছিলেন অরুণের অন্যান্য বন্ধুদের কাছাকাছি সময়ে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন। কর্মজীবন শুরু কলকাতাতেই, কিছু দিনের জন্যে চলে যান দিল্লি, সেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে এবং হিন্দুস্থান কপারে। কলকাতায় ফিরে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক অধ্যাপনা, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে। তাঁর Managerial Performance Appraisal in India (১৯৮৮) বইটি ওই কর্মমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত হয়েছে।